Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1 & 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধ: গণহত্যা ও গণকবর

(Agailjhara in the Liberation War: Genocide and Mass Graves in Eyewitness Accounts)

ড. কালিদাস ভক্ত*

Abstract

The history of Bangladesh's great liberation war is as much about sacrifice as it is about glory. The immense courage of Bengalis has played a key role in making this history. Every conscious man wants to know his own historical heritage. These issues include personal identity, social traditions, and personal legends. Agailjhara is an upazila located in remote areas of Barishal district. A quiet village surrounded by nature's greenery. Due to geographical, social and communal reasons, firebombing, genocide, disappearances, torture and snatching of women took place in Agailjhara during the Great War of Liberation. As far as I know, no significant research work has been completed on the context of the Liberation War of this region. However, at present, people are talking about the 13 most brutal genocide by the Pak intrusing forces in this region. 7 mass graves remind the brutality of Pakistani forces. At the same time, hundreds of freedom fighters of Agailjhara fought bravely to face the Pakistani intruders and upheld the honor of the motherland. It is important to bring that glorious story to future generations. Today is the 53rd year of independence of Bangladesh. Even after so many years of independence, it was not possible to present the true history of the Liberation War to the new generation. Research on Agailjhara's genocide and mass graves is an important issue in writing a correct and complete history of Bangladesh's Liberation War.

ভূমিকা

যেকোনো দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক তাজা প্রাণ আত্মাহুতি দিতে হয়। অনেক ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে হয়। সেক্ষেত্রে আগৈলঝাড়াবাসীকেও মর্মান্তিক ও করুণ পরিণতি বরণ করতে হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় হত্যা-নির্যাতনের মাত্রা ছিল ব্যাপক। ঐতিহাসিক কেতনার বিলে মায়ের কোলে থাকা বারো দিনের শিশু অমৃতকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বুটের তলায় পিষে যেতে দেখা যায়। কোদালধোয়ায় মানুষের

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: kalidasbhakta@du.ac.bd

DOI:

বিনোদনের জন্য আসা সার্কাস পার্টির হাতি, বাঘসহ অনেক বন্য প্রাণিও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বুলেটের শিকার হয়। পাক-আর্মিদের মাটিতে ঠেকে যাওয়া স্পিডবোট উদ্ধারের নামে রাজিহারের খ্রিস্টান পাড়ারনয় জন খ্রিস্টানকে মিথ্যা বলে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। পতিহারে গাছ থেকে ডাব পাড়িয়ে খেয়ে দৌড় দিতে বলে পরবর্তীতে পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করে। এরকম করুণ মৃত্যু আগৈলঝাড়ায় অনেক ঘটেছে। পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে বেশ কয়েকটি স্থানে গণহত্যা চালিয়েছে। সম্প্রতি সাতটি গণকবর চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আগৈলঝাড়ার এসকল গণহত্যা ও গণকবর সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবলী এখন পর্যন্ত স্থান পায়নি। বিষয়গুলো লোক-মুখেই আলোচিত হয়ে আসছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আগৈলঝাড়ায় যে সকল গণহত্যা ঘটেছে এবং যে কয়টি গণকবর চিহ্নিত হয়েছে, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিপূর্ণতা প্রদানে এই বিষয়টি যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করবে।

সাহিত্য বিষয়ক পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন– *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, *একাত্তরের ৭১*, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা*, *কেতনার বিল গণহত্যা*,*কাঠিরা গণহত্যা*, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা* প্রভৃতি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলোতে গণহত্যা ও গণকবর সম্পর্কিত ইতিহাস বিস্তারিতভাবে স্থান পায়নি। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস অনুৎঘাটিত রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে উক্ত বিষয়ে নতুন গবেষণা কর্মের সুযোগ ও যুক্তি রয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার প্রসঙ্গটি বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। গণহত্যা প্রসঙ্গটির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্যও নানাধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যার সঠিক চিত্রএখনও পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়নি। বিশেষ করে আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল এবং যে গণকবরগুলো দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণাকর্মটির উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক) আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার বিষয়টিউপস্থাপন করা।
খ) গণকবরের সঠিক চিত্র তুলে ধরা।
গ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গঠনে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরপ্রতি বার্তা দেওয়া।

গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থায়নে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের শর্ত মোতাবেক আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। অত্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইতোমধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ, নিবন্ধ, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের লিখিত ও সাংখ্যিক মান ব্যবহার করা হয়েছে।মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যে সব স্থানে গণহত্যা হয়েছে, পরে গণকবর দেওয়া হয়েছে সেসকল বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। চিহ্নিত গণকবরগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পূর্ব প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা অনুসরণ করা হয়েছে।এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও মুক্তিযুদ্ধ চর্চায় বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সাথে আনুষ্ঠানিক ওঅনানুষ্ঠানিক আলোচনা করা হয়েছে। এসকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে।

আগৈলঝাড়ার ভৌগোলিক বিবরণ ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

আগৈলঝাড়া উপজেলা বরিশাল জেলার অন্তর্গত। উত্তরে গৌরনদী ও কালকিনি উপজেলা, পূর্বে গৌরনদী ও উজিরপুর, দক্ষিণে উজিরপুর এবং পশ্চিমে কোটালীপাড়া উপজেলা। ১৯৮১ সালে ১৬ জুন গৌরনদী থানা থেকে বিভক্ত হয়ে আগৈলঝাড়া থানা গঠিত হয়। সে হিসেবে গৌরনদীর ইতিহাস ও আগৈলঝাড়ার ইতিহাস একই রকম। গৌরনদী সর্ব প্রথমে ঢাকা জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৮০৬ সালে ঢাকা জেলা থেকে বিভক্ত হয়ে বাকেরগঞ্জ জেলার সাথে যুক্ত হয়। আগৈলঝাড়া ১৯৮৩ সালে ৭ নভেম্বর ৫টি ইউনিয়ন, ৭৮টি মৌজা, ৯৬টি গ্রাম নিয়ে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা নিয়ে বর্তমান বরিশাল–১ সংসদীয় আসন গঠিত। নদ-নদী, খাল-বিলসহ প্রকৃতির সবুজ-শ্যামলে আচ্ছাদিত এলাকা হিসেবে উপজেলাটি পরিচিত। দক্ষিণ বাংলার বিখ্যাত নদী আধার মানিকের শাখা সন্ধ্যা নদী আগৈলঝাড়ার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উপজেলার আয়তন ১৫৫.৪৭ বর্গকিলোমিটার। ভূপৃষ্ঠে ২২.৫৪ থেকে ২৩.০৩ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯০.০৩ থেকে ৯০.১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে আগৈলঝাড়ার অবস্থান।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ থেকেই আগৈলঝাড়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই উত্তাল ছিল। উচ্চ পর্যায় থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। এজন্য আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। বৃটিশ আমল থেকে অত্র এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব গৈলা নিবাসী বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষ বসুর অনুসারী। দেশ মাতৃকার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে ১৯৩১ সালে বৃটিশদের আক্রোশের শিকার হন। তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের হিজলী জেলে বন্দী করা হয়। খুব তাড়াতাড়িই তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে ইংরেজ অফিসারের নির্দেশে তাঁর উপর হিংস্র প্রহরী দলকে লেলিয়ে দেওয়া হলো। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন বিপ্লবী তারকেশ্বর। তাঁর মৃত্যুর পর ২৪ অক্টোবর চিতা ভস্ম সমাহিতকরণের জন্য গৈলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন সর্বত্যাগী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু। এভাবে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২'র ছাত্র আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থাণ, ৭০'র সাধারণ নির্বাচন, ৭১'র মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আগৈলঝাড়ার জনমানুষের অবদান রয়েছে। দক্ষিণ বাংলার বিখ্যাত হেমায়েত বাহিনী ১৯৭১ সালে ১৫মে অত্র উপজেলার আহুতি বাট্‌রা গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গঠিত হয়। এখানে এলাকার বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন–

> হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম, আসমত আলী খান এমপিএ, হরনাথ বাইন এমপিএ, শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এমএনএ প্রমুখ। সদস্য ছিলেন উপজেলার আলতাব হোসেন, (পিতা – মকবুল হোসেন, মধ্য শিহিপাশা), মো. হোসেন মিয়া, (পিতা – সফিজ উদ্দিন মিয়া, বাকাল), কাজী ইলিয়াস হোসেন, (পিতা – কাজী আবদুল হাই, ভালুকশী) সেকেন্দার আলী তালুকদার, (পিতা – আলী তালুকদার, বাদুরতলা) বিশ্বনাথ মল্লিক, (পিতা – অশ্বিনী কুমার মল্লিক, বাকাল), এম এ হক, (পিতা – আবদুস সাত্তার, ফুল্লশ্রী), কাজী সাইফুল ইসলাম, (পিতা – কাজী আ. কাদের, ভালুকশী),

গোলাম মোস্তফা সরদার, (পিতা – আলহাজ্ব সুলতান মাহমুদ সরদার, নগরবাড়ি), কাজী বদিউজ্জামান, (পিতা – কাজী আবদুল হাই, ভালুকশী), কাজী আকরাম হোসেন, (পিতা – কাজী মুজাফফর হোসেন, ভালুকশী), মো. আবদুল খালেক পাইক, (পিতা – মো. আজাহার আলী পাইক, ফুল্লশ্রী) প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।[৯]

এছাড়া আগৈলঝাড়ার রাজনৈতিক অঙ্গন যাদের পদচারণায় সর্বদাই ঋদ্ধ হয়েছে, তাঁরা হলেন– মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, মাওলানা আবুল কাসেম, শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, সুনীল গুপ্ত, আলহাজ্ব আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ্ ও এড. তালুকদার মোঃ ইউনুস প্রমুখ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ও আগৈলঝাড়াবাসীর প্রস্তুতি

বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর আগৈলঝাড়াবাসী মহান মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কেননা বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণে ছিল এক সঞ্জীবনী শক্তি। প্রিয় নেতার আহ্বানে দেশমাতৃকার জন্য কিছু করতে হবে তাই সচেতন জনতা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাঁরা মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর নিকট আত্মীয় কৃষকনেতা শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের নেতৃত্বে 'মুক্তিসেনা দল' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন– মতিউর রহমান তালুকদার (সুজন কাঠি), মিহির দাস গুপ্ত (গৈলা), আইয়ুব আলী মিয়া (মাগুরা), ফজলু ভূঁইয়া (বাশাইল), কাজী শাহ্ আলম (ভালুকশী) প্রমুখ। এই নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আগৈলঝাড়ার বিভিন্ন এলাকায় জনমত গড়ে তোলেন। তাঁরা বিশেষ করে যুবক ও তরুণদের সংগঠিত করতে থাকেন যুদ্ধের ট্রেনিং এবং কৌশল প্রভৃতি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকরা মিলিত হয়ে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প ও হাসপাতাল গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– (ক) বাগধা ইউনিয়নে আশকর গ্রামে বৃন্দারাম মহেষের বাড়ি ও কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। (খ) রাজিহার ইউনিয়নে বাশাইল গ্রামে দ্বিজেন ঘটের বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প (অস্থায়ী) ও বাশাইল হাই স্কুলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। (গ) বাকাল ইউনিয়নে কোদালধোয়া গ্রামে হালদার বাড়িতে ও পাকুরিতা গ্রামে বিশ্বাস বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। (ঘ) রত্নপুর ইউনিয়নে বারো হাজার গ্রামে আক্কেল ভূইয়ার বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের সময় আগৈলঝাড়ায় দুইটি অস্থায়ী হাসপাতাল গঠিত হয়। (ক) পয়সার হাটে মুক্তিযুদ্ধ হাসপাতাল (অস্থায়ী) (খ) আশকর গ্রামে ঠাণ্ডারাম বৈরাগীর বাড়ি মুক্তিযুদ্ধ হাসপাতাল।

২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইট ও আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধ

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের নামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, পুরাণ ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ বেশ কয়েকটি স্থানে হামলা চালায়। বিশেষ করে জগন্নাথ হলের গণহত্যার চিত্র ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারী। এখানে রাত ৯.৩০ টা থেকে আরম্ভ করে সারা রাত ভর মানুষ ধরে এনে তাঁদের দিয়ে কবর খুঁড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ারে হত্যা করে। এ সমস্ত খবর ২৬ তারিখ খুব সকাল থেকে বিভিন্ন দেশের সংবাদ মাধ্যমে (বিবিসি, ভয়েজ অফ আমেরিকা, আকাশ বানী বেতার) গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছার পর পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। বাঙালি জাতি বারুদের আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো গর্জে ওঠে। সেই সাথে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। এতে করে বাংলার সর্বস্তরের জনগণের মতো আগৈলঝাড়ার মানুষও সেদিন যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ২৬ মার্চ গৈলা হাই স্কুল মাঠে

বিভিন্ন গ্রামের যুবক ও তরুণদের নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন অত্র স্কুলের শিক্ষক মোসলেম মাস্টার, সিপাহি আলাউদ্দিন, আনসার কমান্ডার সেকেন্দার শাহ্ প্রমুখ। এছাড়া ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমি মাঠে প্রশিক্ষণ দেন আব্দুল খালেক পাইক ও নজরালী ফকির। তবে পরে নজরালী ফকির শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। গৌরনদী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে আগৈলঝাড়ার অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন। তখন কয়েক হাজার তরুণ ও যুবক যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২৫ এপ্রিল পাকসেনারা বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে ঢুকতে চেষ্টা করে। গৌরনদী উপজেলার কটকস্থলের মহাসড়কের কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকসেনাদের প্রতিরোধ করার দুর্বার মানসিকতায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের কাছে তাঁরা হার মানেন। যুদ্ধে শহীদ হন এলাকার বীর সন্তান গৈলা গ্রামের সিপাহি আলাউদ্দিন, নাঠৈ গ্রামের সৈয়দ আবুল হাসেম, চাঁদশী গ্রামের মোকতার হোসেন ও পরিমল মণ্ডলসহ আশে-পাশের অনেক গ্রামবাসী। এই ২৫ এপ্রিল গৌরনদী উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঘাঁটি দখল করে পাকিস্তানী আর্মি ক্যাম্প স্থাপন করে। এরপরে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকার বাহিনী ও শান্তি কমিটি গঠিত হয় এবং শুরু হয় ধর্ষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, গণহত্যা।

এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক, গৌরনদী ও আগৈলঝাড়ার সংসদীয় আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার মোঃ ইউনুস বলেন–

> পাকসেনারা গৌরনদী কলেজে মিনি-ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করে আগৈলঝাড়ায়, কাঠিরায়, কেতনার বিলে, কোদালধোয়ায়, গৈলায়, বাকালসহ বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, বহু সাবালিকা ও নারী ধরে নিয়ে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। হঠাৎ করে এ অঞ্চলে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা এটাই বলতে চাই বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করেছে ১৬ ডিসেম্বর আর গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া বিজয় অর্জন করে ২২ ডিসেম্বর। কারণ হলো পাকসেনারা এতো বেশি অত্যাচার-নির্যাতন করেছে যে, যখন পর্যন্ত মিত্র বাহিনী না আসছে ততদিন পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেনি। আর অত্র এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন জননেতা আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ্।[২]

এ প্রসঙ্গে বর্তমান আগৈলঝাড়া উপজেলার চেয়ারম্যান ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য আব্দুর রইচ সেরনিয়াবাত বলেন–

> দেশের বিভিন্ন এলাকায় যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। আমরাও বরিশালের বৃহত্তর গৌরনদী থানাসহ দক্ষিণাঞ্চলের সকল থানাসমূহে বিদ্রোহ গড়ে তুলি। এর ধারাবাহিকতায় আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের নির্দেশনায় ও রকিব সেরনিয়াবাতের নেতৃত্বে গৌরনদীর থানা আক্রমণ করে পুলিশের সমস্ত অস্ত্র ছিনিয়ে এনে গৌরনদী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হরলাল গাঙ্গুলির বাড়িতে কলেজ হোস্টেলে ক্যাম্প গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার লক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে এক্স সেনা সদস্য, এক্স পুলিশ সদস্য, বিভিন্ন এলাকার সশস্ত্র বিদ্রোহী সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য, সেই সাথে ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হই।[৩]

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী একুশে পদক প্রাপ্ত সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা অজয় দাসগুপ্তবলেন–

> এক একটি এলাকা দখল করে সেখানে মানুষ মারা হয়েছে পাখির মতো গুলি করে কিংবা বেয়নেটের খোঁচায়। জামায়াতে ইসলামীসহ আরও কয়েকটি দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তারা হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে এবং জবাই করেও অনেককে হত্যা করেছে। বসতবাড়ি, বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছে। পাক আর্মির কাছে মানুষ মারা এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া ছিল নিত্যদিনের খেলার মতো।[৪]

১৪ মে পাক আর্মিরা গৌরনদীর উপজেলার বাকাই, দোনারকান্দি গ্রামে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বার্থী নামক স্টেশনে নেমে পশ্চিম দিকের মাটির রাস্তা ধরে এগুতে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের হত্যার জন্য স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় বাকাই গ্রামে পৌঁছে প্রথমে বাকাই সংস্কৃত কলেজ ও গ্রামের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং সামনে যাকে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। এই খবর পশ্চিম দিকের গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তারা পাকবাহিনীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দোনারকান্দিসহ আশপাশের লোকজন নিয়ে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাক-বাহিনীও মেটো রাস্তা ধরে রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুতে থাকে। দেশমাতৃকার আহ্বানে আগুয়ান এই জনতাকে নেতৃত্ব দেন দোনারকান্দি নিবাসী অনিল মল্লিক। তাঁরা ঝুপি, ল্যাজা, কতু, দা, বঁটি, লাঠি, লগি, ঢাল, তীর, ধনুক প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দুর্বার আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। উভয় পক্ষের মধ্যে সামনা-সামনি যুদ্ধে চার জন পাকসেনা নিহত হয়। একটি গুলি অনিল মল্লিকের উরুতে বিদ্ধ হলে অবিরাম রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরের দিন পাকসেনারা প্রতিশোধের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চারপাশের বিভিন্ন এলাকায় অগ্নি সংযোগ করে ও নির্বিচারে মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। তবে আগৈলঝাড়ার গণহত্যা সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা বাকাইতে বাকাল হয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ ইংরেজি 'আই'তে ফুলস্টপ না দেওয়ায় বাকাল হয়ে যায়। তাই বাকালের দিকে অগ্রসর হতে হতে টরকী, রামসিদ্ধি, চাঁদশী, শিহিপাশা, রাজিহার, রাংতা, কেতনার বিল এবং পরে বাকালে গণহত্যা চালায়। তারপরে পশ্চিম সুজনকাঠি, রথখোলা, গৈলা দত্তবাড়ি, পতিহার, কাঠিরা ও বাগদা দাস পাড়ায় সাধারণ জনগণ গণহত্যার শিকার হন। এছাড়া পাকবাহিনী রামশীল ও কোটালীপাড়া যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হেমায়েত বাহিনীর ঘাঁটি উচ্ছেদের জন্য আক্রমণ করলে পয়সার হাটে ২১ মে সরাসরি যুদ্ধ হয়। আবার আমবৌলাতে বেইজ কমান্ডার আইয়ুব আলী মিয়ার নেতৃত্বে সরাসরি যুদ্ধ হয় তাতে চার জন পাকসেনা নিহত হয়।

ইংরেজি Genocide কে বাংলায় বলা হয় গণহত্যা। 'গণ' অর্থ হলো বহু মানুষ আর 'হত্যা' অর্থ হলো প্রাণনাশ বা খুন করা। একসাথে বহু মানুষ হত্যাই গণহত্যা। মূলত পরিকল্পিতভাবে কোনো এলাকায় বহু মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার নামই গণহত্যা। জাতিসংঘের দৃষ্টিতে গণহত্যা হলো একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস। আগৈলঝাড়ায় অনেকাংশে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মহান স্বাধীনতার দীর্ঘ তিপ্পান্ন বছর পর মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা অসম্ভব। কেননা অনেক প্রত্যক্ষদর্শী মৃত্যুবরণ করেছেন, স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে যতটা সম্ভব সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আগৈলঝাড়া উপজেলায় পাকসেনাদের অনেকগুলো গণহত্যার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো নিম্নরূপ:

কেতনার বিলের গণহত্যা

কেতনার বিল আগৈলঝাড়া উপজেলা সদর থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে রাংতা গ্রামে অবস্থিত। বরিশালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ আসলে গণত্যার দিক থেকে কেতনার বিলের নামটি সর্বাগ্রে চলে আসে। কেননা নিরস্ত্র মানুষের উপর এ রকম ব্যাপক গণহত্যার ইতিহাস বরিশাল বিভাগে দ্বিতীয়টি নেই। ১৯৭১ সালের ১৫ মে সকাল দশটার দিকে হঠাৎ গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে যায়। ভয়ে কারো মুখে কথা নেই। খাঁকি পোষাক, মাথায় হেলমেট, পিঠে-কাঁধে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাক-হানাদার বাহিনীর বিশাল বহর রাংতা গ্রামের রাস্তায় হাজির। যাদের অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়ঙ্কর কাহিনি গ্রামবাসী লোক মুখে শুনেছে। যতদূর চোখ যায় সারিবদ্ধ পাকবাহিনীর বিশাল বহরটি এগোচ্ছে আর অগ্নি সংযোগে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। মুহূর্তেই ভয়ার্ত জনতা ছুটে পালাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে, ঘন বন-জঙ্গল কিংবা বৃক্ষরাজি

লতা-পাতায় ঢাকা ডোবা-পুকুরের মধ্যে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ভীত সন্ত্রস্ত কিশোরীরা ও বিভিন্ন বয়সের নারীরা পালিয়ে থাকলে তাদের ধরে এনে পাশবিক নির্যাতনের পর অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করে। সমগ্র এলাকায় বসত বাড়ি জন-মানব শূন্য। পাক হানাদাররা তাই খোলা মাঠ পেড়িয়ে বিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত নির্জন বিলে আশ্রয় নিয়েছিল আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রাম জেলা উপজেলা থেকে আসা শত-শত ঘরবাড়ি হারানো মানুষ। পাকসেনারা মুহূর্তের মধ্যে ব্রাশফায়ার এবং গ্রেনেডের আঘাতে হত্যা করে শত শত মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য মতে এখানে এক হাজার থেকে দেড় হাজার লোক হত্যা করা হয়েছে। এই বিলের মধ্যে পাত্র বাড়ি, বেপারী বাড়ি ও বিলের নানা ভিটা-ডোবায় আশ্রয় নেওয়া মানুষগুলো নিশ্চিন্ত ছিল এই গহীন বিলে পাকসেনারা প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তাদের সকল ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। স্থানীয় রাজাকারদের দেখানো পথে অতি সহজেই বিলের মধ্যে চলে আসে পাকবাহিনী।

সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ পরিবারের সদস্য রাজেন্দ্রনাথ পাত্র জানান–

> মিলিটারি আসার খবর পেয়ে কসবা, রামসিদ্ধি, ধানডোবা, সমদ্দারপাড়, চাঁদশী, সাত কাপুলা, রাংতা, রাজিহারসহ আশপাশের সমস্ত লোকজন কেতনার বিল নিরাপদ আশ্রয় মনে করে হাটু সমান পানি অতিক্রম করে বিলের মধ্যে পাত্র বাড়িতে এবং পাত্র বাড়ির চার পাশের ধানক্ষেতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মিলিটারিরা সকাল ১১টার দিকে রাস্তার পাশ দিয়ে চুপিচুপি এগুতে থাকে। তারপরে গনি ব্যপারীর বাড়িতে এসে ফাঁকা গুলি করে। সাথে সাথে মানুষ দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি শুরু করে। তখন মিলিটারিরা উত্তর দিকের খাল পাড় হয়ে বেপারী বাড়িসহ আশ-পাশের প্রচুর মানুষ হত্যা করে। এরপরে উত্তর পশ্চিম দিকের কেতনার বিলের মধ্যে উঁচু ভিটায় ওঠে গুলি শুরু করে। পূর্ব পাশের পাত্র বাড়িতে উঠে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রামসিদ্ধি গ্রাম থেকে আসা নারায়ণ পাল নামে এক ব্যক্তি মন্দিরে ঢুকে প্রার্থনা করতে থাকে তাঁকে প্রথমে গুলি করে মন্দিরসহ পুড়িয়ে দেয়। এক মহিলার কোলে বারো দিনের এক পুত্র সন্তান ছিল, প্রথমে ঐ মহিলাকে গুলি করে পরে বাচ্চাটিকে পা দিয়ে পাড়া দিয়ে নারি-ভুরি বের করে হত্যা করে। চাঁদশী গ্রামের এক বছরের ছেলে যতীন। তার মায়ের কোলে বসে গুলি লাগে। সে আজও পঙ্গুত্ব বরণ করে বেঁচে আছেন। সেদিন পাত্র বাড়িতেই ১৯ জনকে মেরে ফেল হয়। তাঁদের মধ্যে এক পরিবারের এক বছর বয়সী কবিতা নামে এক মেয়ে বেঁচে যায়। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশে ধান ক্ষেতে শতশত লোক আশ্রয় নিয়েছিল। অনেকে দৌড়াদৌড়ি করে যখন পালাতে চেষ্টা করে তখন মিলিটারিরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে পাখির মতো মানুষ মারতে থাকে। ধানক্ষেত তখন রক্ত গঙ্গা হয়ে যায়।[৩]

সেদিন শত শত শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম জানা যায়–

১. আব্দুর রাজ্জাক (৪৫), পিতা – হাবিবুর রহমান, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. মৈজদ্দিন হাওলাদার (৪৫), পিতা– আবদুল কাদির হাওলাদার, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. হোসেন বেপারি (৩০), পিতা – ফৈজদ্দিন বেপারি, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. তালেব বেপারি (৩৫), পিতা – এছিন বেপারি, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. আবদুল হক ফকির (৪০), পিতা – নোয়াব আলী ফকির, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. ফরহাদ ফকির (২৫), পিতা – ডাঃ জোনাব আলী ফকির, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. রশিদ ফকির (৩০), পিতা – ডাঃ জোনাব আলী ফকির, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

৮. শ্রীমন্ত পাত্র (৩৫), পিতা – অধর পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. অধর পাত্র (৫৫), পিতা – গোকুল পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. চৈতন্য পাত্র (৫), পিতা – শ্রীমন্ত পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১. শম্ভু বৈদ্য (২০), পিতা – রামচরণ বৈদ্য, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. রাজবিহারী বৈদ্য (২৫), পিতা – রাইচরণ বৈদ্য, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৩. কৃষ্ণকান্ত বৈদ্য (৩৫), পিতা – উপাচরণ বৈদ্য, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৪. বিমল বেপারি (৪০), পিতা – বিনোদ বেপারি, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৫. নিতাই বেপারি (৩৫), পিতা – মাধব বেপারি, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৬. নিবারণ বিশ্বাস (২৫), পিতা – গোপাল বিশ্বাস, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৭. মঙ্গল পাত্র (৩০), পিতা – বিহারী পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৮. বিনোদ পাত্র (৪০), পিতা – দশরথ পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৯. কাশীনাথ পাত্র (৫০), পিতা – পতকী পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২০. মতি পাত্র (৪৫), পিতা – সদানন্দ পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২১. মোহন পাত্র (৩৫), পিতা – রাহুল পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২২. বিপুল পাত্র (১০), পিতা – কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৩. সাজু বিবি (৩০), স্বামী – আরেফ উদ্দিন মোল্লা, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৪. সাহেদা বেগম (২৫), স্বামী – আঃ রহমান মোল্লা, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৫. চান বরু (৪০), স্বামী – কাসেম মোল্লা, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৬. সানু আক্তার (২০), পিতা – শফি মোল্লা, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৭. মালতী রাণী (২৮), স্বামী – রাম প্রসাদ, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৮. শোভা রাণী (৫), পিতা – রাম প্রসাদ, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৯. বকুল রাণী বেপারী (৮), পিতা – বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩০. গীতা রাণী (২৫), স্বামী – অধর পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩১. কানন রাণী (২০), স্বামী – বিনোদ পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩২. কাননী (৩), পিতা – বিনোদ পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৩. গীতা পাত্র (১৫), পিতা – বিনোদ পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৪. সরস্বতী পাত্র (৩৫), স্বামী – মঙ্গল পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়, বরিশাল
৩৫. বিজয়া (২০), স্বামী – দেবেন্দ্র পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৬. বেস লক্ষ্মী পাত্র (৩০), স্বামী – লক্ষ্মী কান্ত পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৭. ত্রিফুলী পাত্র (৪০), স্বামী – কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৮. মঞ্জু পাত্র (১৮), পিতা – কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩৯. বিষ্ণু পাত্র (৭), পিতা – কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪০. সাবিত্রি ঘরামী (৩০), স্বামী – রজনী কান্ত ঘরামী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪১. নিভা ঘরামী (১০), পিতা – রজনী কান্ত ঘরামী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪২. মনিকা রানী ঘরামী (৩০), স্বামী – রঞ্জন ঘরামী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৩. হরিবালা বাড়ৈ (২৫), স্বামী – কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৪. অঞ্জলি বাড়ৈ (৭), পিতা – কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৫. কাকলী বাড়ৈ (৫), পিতা – কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৬. পরিমল দে, পিতা – বসন্ত দে, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৪৭. নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য, বরিশাল
৪৮. মায়া রানী ভট্টাচার্য, স্বামী – নিমচাঁদ চক্রবর্তী, বরিশাল
৪৯. পুতুল বরকন্দাজ, পিতা – বিনোদ বরকন্দাজ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল

৫০. যুথি বরকন্দাজ, পিতা – সুরেশ বককন্দাজ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫১. বগলা বাছার, পিতা – কাশিশ্বর বাছার, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫২. ললিতা সুন্দরী মাল, স্বামী – হরেন মাল, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৩. সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতা – বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৪. গীতা রানী চক্রবর্তী, স্বামী –নিতাই চক্রবর্তী, টরকী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৫. সুভাষ চক্রবর্তী, পিতা – নিরোদ চক্রবর্তী, টরকী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৬. রাধেশ্যাম কর (২২), পিতা – রাখাল কর, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৭. মালতী বেপারী স্বামী – ভগিরথ বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৮. বিজয়া রানী (২৫), স্বামী – মনোরঞ্জন, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৫৯. বুড়ি বেপারী (১০), পিতা – নিরঞ্জন বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬০. অমিত দাস (২৫), পিতা – জয়দেব দাস, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬১. প্রকাশ দাস (৩০), পিতা – পরিমল দাস, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬২. বসন্ত দাস (৬০), পিতা – উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৩. রজনী পাল (৬৫), পিতা – উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৪. অক্ষয় চক্রবর্তী(৭০), পিতা – উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৫. লেবু গোমস্তা (৩০), পিতা – উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৬. রেনুকা বালা (৩০), স্বামী – অক্ষয় কুমার মণ্ডল, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৭. বিহারী সিকদার (৬০), পিতা – উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৮. রাখাল কর (৩৫), পিতা – রজনী কর, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৬৯. কাশীরাম কর (৩০), পিতা – রজনী কর, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭০. স্বপন কুমার বসু (২২), পিতা – মুকুন্দ নাথ বসু, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭১. যুথিকা বসু (১৯), পিতা – মুকুন্দ নাথ বসু, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭২. শেফালী বসু (১৬), পিতা – মুকুন্দ নাথ বসু, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৩. মায়া ভট্টাচার্য (২৬), স্বামী – নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৪. ননী বালা (৪০), স্বামী – সুবোধ চক্রবর্তী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৫. শঙ্কর চক্রবর্তী (১৫), পিতা – সুবোধ চক্রবর্তী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৬. দুর্গা বরকন্দাজ (১৭), পিতা – ঈশ্বর বরকন্দাজ, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৭. রেনুকা আচার্য (৩৮), স্বামী – হারান চক্রবর্তী, উত্তর চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৮. প্রকাশ চন্দ্র দাস (৬৫), পিতা – আনন্দ দাস, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৭৯. জয়দেব দাস (৯), পিতা – প্রকাশ চন্দ্র দাস, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮০. অনন্ত গাইন (৪৫), চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮১. খোকন গাইন (৫), পিতা – অনন্ত গাইন, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮২. ফুলি (৫৫), রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল (ভিক্ষুক)
৮৩. অন্ন বেপারী (৩৫), স্বামী – ভগিরথ বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৪. সরস্বতী বেপারী (৫), পিতা – ভগীরথ বেপারী, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৫. কেষব দত্ত (৪০), পিতা – রজনীকান্ত দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৬. মনিবালা দত্ত (৩০), স্বামী – কেষব দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৭. কুঞ্জবিহারী দত্ত, (৪৫) পিতা – তারাচাঁদ দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
৮৮. নারায়ণ ভূঁইয়া, রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮৯. নারায়ণ ভূঁইয়ার স্ত্রী (৪০), রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯০. গীতা ভূঁইয়া, পিতা – নারায়ণ ভূঁইয়া, রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়, বরিশাল
৯১. অতুল পাল, দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

৯২. অতুল পালের মা (৬০), দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৩. নারায়ণ পাল (৬৫), দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৪. রজনী, দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৫. বসন্ত নন্দীর স্ত্রী, দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৬. সুদেব বেপার (৩৫), দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৭. সেকেন্দার বেপারী (৬৫), দক্ষিণ রামসিদ্ধি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৮. শচীন্দ্র নাথ ভূঁইয়া, পুরোহিত, তারাকুপি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯৯. সুবোধ চন্দ্র ভূঁইয়া, সেবাইত, বার্থী, গৌরনদী, বরিশাল
১০০. রমেশ চন্দ্র কাপালী (৫৫), পিতা – তারাকুপি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০১. লেমন সুন্দরী (৪০), স্বামী – সদানন্দ বাড়ৈ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল
১০২. শ্যামল বাড়ৈ (১২), পিতা – সদানন্দ বাড়ৈ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।*

এছাড়াও শত শত নাম না জানা লোক কেতনার বিলে শহিদ হয়েছেন।

নিহত হয় শিশু অমৃত পাত্র (১২ দিনের), পিতা – কার্তিক পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল।

সেদিন অনেকেই আহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ ঘটনার তিন-চার দিন পরও মারা যান। এখনও পঙ্গুত্ব নিয়ে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত মানবেতরভাবে বেঁচে আছেন। তাঁরা হলেন–

১. যতীন বাড়ৈ (৫৯), পিতা – কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল (দিনমজুর)
২. বিল্লু পাত্র (৬১), পিতা – লক্ষ্মী পাত্র, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল (দিনমজুর)
৩. করিম মোল্লা (৬২), পিতা – রফিক মোল্লা, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল (দিনমজুর)
৪. ভুলু দত্ত (৬৫), পিতা – কেষব দত্ত, চাঁদশী, গৌরনদী, বরিশাল (কৃষক)
৫. ভক্তি বিবি (৬২), স্বামী–খোরশেদ মিয়া, গ্রাম– উত্তর শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল (কৃষক)
৬. সুখরঞ্জন বেপারী (৬৬), পিতা – নিরঞ্জন বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল (কৃষক)

কাঠিরা গণহত্যা–

আগৈলঝাড়া উপজেলার অতি সন্নিকটে কাঠিরা গ্রাম। উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। ৩০ মে কাঠিরা গণহত্যা সংঘটিত হয়। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চের পর থেকে কাঠিরার পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় 'ঘোড়ারপাড় দিপ্তী ভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়' ও উপজেলা সদরের 'ভেঁগাই হালদার পাবলিক একাডেমী' কোনো রকমের ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায় কেননা সবার মনে শুধু আতঙ্ক। ছাত্র- শিক্ষক কেউই বিদ্যালয়ে আসেন না। চারদিকে কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। তবে কয়েকজন উদ্দীপ্ত তরুণের কণ্ঠস্বরে ফুলশ্রী গ্রামের দিক থেকে মিছিল আসে – জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি – তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা – এরূপ নানা শ্লোগানে। কতিপয় ছাত্র বিদ্যালয়ে না গেলেও মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। জনমনে ভয় তাড়িয়ে বেড়ায়। বাড়িতে বন্ধুরা মিলে মুক্তিযোদ্ধা-রাজাকার যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করে। এমনি উত্তাল অবস্থায় মার্চ-এপ্রিল মাসে আগৈলঝাড়া ভেঁগাই হালদার পাবলিক বিদ্যালয় মাঠে আব্দুল খালেক পাইক ও নজরালী ফকির যুবকদের নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে সারে তিন হাত বাঁশের লাঠি দিয়ে ট্রেনিং করাতেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এর ভিতর

নজরালী ফকির কুখ্যাত রাজাকারে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ে যেতে হয় না বলে ছাত্রদের আনন্দ, কিন্তু বড়দের মুখে পাকিস্তানি সেনা ও দেশীয় রাজাকারদের কথা শুনে একটি আতংক সর্বদাই বিরাজ করে। রাতে দেখা যায় কারো চোখে ঘুম আসে না। মানুষ নিম্নাঞ্চলের দিকে এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে প্রাণ রক্ষার তাগিদে আশ্রয় নিয়েছে। কাঠিরা গ্রামের একমাত্র সরকারী চাকুরীজীবী কৃষ্ণদাস হালদার এ প্রসঙ্গে বললেন – বাড়িতে থাকা যাবে না, কোদালধোয়া গ্রামে চলে যাই। সেখানে লক্ষণ দাস মহাশয় সার্কাস দল নিয়ে পালাতে এসেছেন। এভাবে মানুষ নিজের আশ্রয়স্থান ছেড়ে আত্মরক্ষা করে। এই সুযোগে রাজাকারেরা হিন্দু বাড়িতে গিয়ে ধান-চাল, গরু-ছাগল, সহায়-সম্বল লুট-পাট করত, বাড়িতে আগুন দিত এবং নারীদের সম্ভ্রমহানী করত।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বর্তমানে কাঠিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক দীনেশ চন্দ্র হালদার বলেন–

> মিলিটারির উপস্থিতি টের পেয়ে আমি গ্রামের পাশে আঙ্কর বিলে একটি ভিটায় আশ্রয় নিই। এরপরে দেখি উত্তর দিক থেকে অগ্নিময় ধোঁয়া উড়ছে আর মানুষগুলো দক্ষিণ দিকে দৌড়ে আসছে। বেলা তখন চারটা। শোনা গেল মিলিটারি চলে গেছে। আমরা মাকেসহ বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। বাড়ি আসতে প্রথম যে মৃত দেহটি দেখলাম তা সাধু রাইচরণ বৈরাগী মহাশয়ের। তিনি আঙ্কর শ্রীশ্রী হরি মন্দিরে সাধনারত ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে গুলি করে মারা হয়। এ অঞ্চলে একটি জনশ্রুতি আছে তাঁকে যে মিলিটারি মেরেছে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে পাক-আর্মিরা তাকে ধরে গৌরনদী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পরে সে মারা যায়। সেদিন সেনাটি অসুস্থ না হলে পাকসেনাদের তাণ্ডব থামত না। তারপরেও যা দেখলাম মনে হয়েছে যেন কারবালার যুদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে একটি লাশ ওখানে একটি লাশ। মানুষেরা তাঁদের স্বজনদের খুঁজছে আর জিজ্ঞাসা করছে – আমার বাবাকে দেখেছ! আমার মাকে দেখেছ! আমার ভাইকে দেখেছ! এই দৃশ্য দেখতে দেখতে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখি আমার বংশের জ্যাঠা মহাশয়সহ তাঁর দুই পুত্রের লাশ পড়ে আছে।[৩]

কাঠিরার যাঁরা গণহত্যার শিকার হন, তাঁদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. শ্যামকান্ত রায়, পিতা – চূড়ামণি রায়, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. হরিপদ মণ্ডল, পিতা – বাসীরাম মণ্ডল, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. লালমোহন হালদার, পিতা – ভুবন হালদার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. দ্বিজবর বাড়ৈ, পিতা – ভজন বাড়ৈ, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. মোহন হালদার, পিতা – পরিমল হালদার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. পূর্ণচন্দ্র কর্মকার, পিতা – বিপিন কর্মকার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. দিব্যাবতী বৈরাগী, পিতা – মনোহর বৈরাগী, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. সুরেন হালদার, পিতা – হরিচরণ হালদার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. দুঃখীরাম হালদার, পিতা – সনাতন হালদার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. শ্রীনাথ হালদার, পিতা – মনমথ হালদার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১. জগীন্দ্র মধু, পিতা – এককড়ি মধু, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. রণজিৎ মধু, পিতা – সনাতন মধু, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৩. নারায়ণ মধু, পিতা –হরিচরণ মধু, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৪. মনরঞ্জন মধু, পিতা – হরিচরণ মধু, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৫. রামচন্দ্র বাড়ৈ, পিতা– শ্রীনাথ বাড়ৈ, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৬. জলধর কীর্তনীয়া, পিতা– কানাই কীর্তনীয়া,কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৭. লালমোহন কীর্তনীয়া, পিতা– জগবন্ধু কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

১৮. নারায়ণ কীর্তনীয়া, পিতা– রামকৃষ্ণ কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৯. যোগেশ কীর্তনীয়া, পিতা– রজনীকান্ত কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২০. অনিল কীর্তনীয়া, পিতা– রজনীকান্ত কীর্তনীয়া, ঘোড়ারপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২১. লক্ষ্মীরানী সুতার, স্বামী – কানাই লাল সুতার, ঘোড়ারপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২২. হারাধন মিস্ত্রী, পিতা – নেপাল মিস্ত্রী, ঘোড়ারপাড়, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৩. অক্ষয় কুমার বিশ্বাস, পিতা – রামচরণ বিশ্বাস, হাওলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৪. যোগেশ চন্দ্র হালদার, পিতা – রাজকুমার হালদার, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৫. ধীরেন্দ্রনাথ হালদার, পিতা –যোগেশ চন্দ্র হালদার, বাকাল আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৬. রণজিৎ কুমার হালদার, পিতা –যোগেশ চন্দ্র হালদার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৭. বাসীরাম হালদার, পিতা – গুরুচরণ হালদার, ঐচারমাঠ, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৮. জ্যোতিষ রায়, পিতা – আনন্দ রায়, রাহুতপাড়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২৯. সাধক রাইচরণ বৈরাগী, পিতা–নন্দরাম বৈরাগী, সমাধি আস্কর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩০. মন্মথ হালদার, পিতা – পাঁচকড়ি হালদার, কাঠিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

বাকাল গণহত্যা–

দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় আগৈলঝাড়ায় মুক্তিযুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেয়। রাজাকারেরা বিখ্যাত হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে দেখে দেখে পাকবাহিনী খবর দিয়ে এনে হত্যা করাতে থাকে। এমন অবস্থায় ১৪ জুলাই পাকসেনারা প্রথম বাকাল আক্রমণ করে। পাকহানাদার বাহিনী প্রথমে ঢুকে ইঞ্জিনিয়ার সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি টের পেয়ে পাশের বাগানের মধ্যে একটি গর্তে লুকিয়ে থাকেন। পরে হানাদারেরা পূর্ব পাশের মুসলিম বাড়িতে গিয়ে এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দেয় লুকানোর স্থান। তখন বাগানের গর্ত থেকে তাঁকে ধরতে গেলে তাঁর হাতের বড় বেতের লাঠি দিয়ে পাকসেনাদের আঘাত করেন। অতঃপর পাকবাহিনীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের ঐ লাঠি দিয়ে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রথমে পিটিয়ে আহত করে পরে আবার গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে। এরপরে বাকাল গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করে এবং গুলি করে মানুষ হত্যা করতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়সহ ১০-১৫ জনকে হত্যার পর সাধারণ মানুষ বাড়িতে অবস্থান না করে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তবে শূন্য বাড়িতে অগ্নিসংযোগের সাথে সাথে গাছ-পালাও মর্টার শেলে, কামানে, বুলেটে ঝাঁঝড়া করে দেয়। সেইসাথে রাজাকারেরা লুটপাট করে হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি নিজেদের হস্তগত করে। তবে বাকাল গ্রামের মতো এত বেশি পাকসেনারা আগৈলঝাড়ার অন্য কোনো গ্রামে আসেনি।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হরেকৃষ্ণ রায় পলাশ বলেন–

> সকালে পান্তা খেয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। মানিক মোড়ল, মধুসূদন হালদার এবং আমি একসাথে থাকতাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম মিলিটারি এসেছে। অনেক ঘরে আগুন দিয়েছে। আমরা তিন জন একটা উচু গাছে উঠে দেখতে পেলাম অনেক বাড়িতে আগুন দিয়েছে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি খাঁকি পোশাক পড়া, মাথায় লোহার টুপির মতো, পায়ে বড়ো বড়ো জুতা, কাঁধে রাইফেল নিয়ে কাদের যেন খুঁজছে। পাক-আর্মিরা দূরে চলে গেলে আমরা ভয়ে গাছ থেকে নেমে বেহুলার পাড় কালী মন্দিরের আন্ধিতে (দিঘিতে) কচুরিপানার মধ্যে একঘণ্টা লুকিয়ে ছিলাম। মিলিটারি চলে যাওয়ার পরে বিকেলে শুধু মানুষের হাহাকার আর কান্নার রোল শুনতে পেলাম। কেউ কেউ আবার চিৎকার করে কান্না করতে নিষেধ করলো। গ্রামখানা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। প্রায় ত্রিশটা বাড়ির পঞ্চাশখানা ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। পূর্ব পাড়ায় সনাতন কুলুর লাশ, পশ্চিম পাড়ায় দুলাল রাহার লাশের পাশে স্বজনরা ক্রন্দন করছে। পরের দিন আবার মিলিটারি আসার খবর

পেয়ে আমরা তিন জন বড় রেন্ট্রি গাছে উঠে দেখি প্রায় পঞ্চাশ জন মিলিটারি সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে বাগানের গর্ত থেকে এনে নির্মমভাবে পিটিয়ে ও গুলি করে হত্যা করলো।[৭]

এভাবে বাকাল গ্রামে সাত বার পাকবাহিনীরা আক্রমণ করে। তখন গণহত্যার শিকার হন–

১. সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পিতা – চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. যোগেশচন্দ্র হালদার, পিতা – রাজবিহারি হালদার, পিতা – বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. ধীরেন হালদার, পিতা –যোগেশচন্দ্র হালদার, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. রণজিৎ হালদার (কুটি), পিতা – যোগেশচন্দ্র হালদার, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. দুলাল রাহা, পিতা – মতিলাল রাহা, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. সনাতন কুলু, পিতা – মাধব কুলু, পিতা – বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা – জগানন্দ চক্রবর্তী, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. ননীচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা – জগানন্দ চক্রবর্তী, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা – জগানন্দ চক্রবর্তী, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. ইসমাই হোসেন হাওলাদার, পিতা – দলিল উদ্দিন হাওলাদার, বাকাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

কোদালধোয়া গণহত্যা

তৎকালীন গৌরনদী উপজেলার অন্তর্গত কোদালধোয়া একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। এটি গৌরনদী উপজেলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত হলেও রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতো। অত্র এলাকার বিখ্যাত এমবিবিএস ডাঃ সতীশ বালা ঐ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বর্তমানে আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত। বাংলা ১৩৭৮ সালে ১ আষাঢ় পাকবাহিনী কোদালধোয়া গ্রামে আক্রমণ করে। এত প্রত্যন্ত এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের কারণ হলো, এখানকার শতকরা একশভাগ লোকই মুজিব আদর্শের অনুসারী এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী। অপরদিকে পাকিস্তান সার্কাস-এর সত্ত্বাধিকারী লক্ষণ দাস জীবন রক্ষার্থে ঐ গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদল রাজাকার তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের গ্রামে নিয়ে আসে। তারা স্পিডবোট আসলেও গ্রামের কাছাকাছি এসে যাতে শব্দ না হয় সেজন্য মেশিন বন্ধ করে গুন টেনে খালের মধ্যে দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করে। তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল লক্ষণ দাসকে হত্যা করা। তিনি শত্রুর আক্রমণ বুঝতে পেরে কোদালধোয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কালী মন্দিরের সামনে থেকে ওঠে দৌড়ে সরকার বাড়ির পুকুর পাড়ে মেঠো পথ দিয়ে আত্মরক্ষার্থে ডোবার মধ্যে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তখন রাজাকারদের সহায়তায় হানাদার বাহিনীর সদস্যরা পেছনে তাড়া করে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। বিদ্যালয়ের উত্তর পাশে বাগানের মধ্যে একটি উঁচু ঢিবি ছিল সেখানে তাল গাছের সাথে সার্কাসের হাতিটি বাঁধা ছিল পাকবাহিনী সেটিকেও গুলি করে হত্যা করে। সেইসাথে সার্কাসের অনেকগুলো পশু ও পাখি হত্যা করে। পরে তারা গ্রামে ২০/২৫ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শিশুসহ ১৫ জনের মতো হত্যা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাবার কোলে থাকা এক বছরের একটি শিশুকেও তারা হত্যা করে। এভাবে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই তারা হত্যা করেছে।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুনীল সরকার বলেন–

> পাকিস্তানি মিলিটারির উপস্থিতি টের পেয়ে আমি দৌড়ে একটি গাছে উঠে দেখি জয়ধর বাড়ি, মুড়ি বাড়ি (হালদার বাড়ি), পাণ্ডে বাড়ি, বৈষ্ণব বাড়ি, ওঝা বাড়ি, হাজরা বাড়ি ও দাস বাড়িতে আগুনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলীর মতো দাউ দাউ করে উপরের দিকে উঠছে। মাঝে মাঝে গুলির শব্দে ভয়ে গা ছমছম করে কাঁপছে। এভাবে মিলিটারির দেড় ঘণ্টার মতো তাণ্ডব চালায়। গাছে প্রায় আধা ঘণ্টার মতো থাকার পর গাছ থেকে নেমে বৈষ্ণব বাড়িতে দেখি বাবার কোলে বসে নিহত ২বছর বয়সী স্বপন বৈষ্ণবের লাশ, ওঝা বাড়িতে গিয়ে দেখি নরেশ ওঝা ও ব্রজেন্দ্র ওঝার লাশ, পাণ্ডে বাড়িতে নিবারণ পাণ্ডের লাশ, হাজরা বাড়িতে প্যাকা হাজরার লাশ, দাস বাড়িতে যতীন দাস ও রশিক দাসের লাশ এছাড়া পাক-আর্মিরা দক্ষিণ পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় অনেক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, অনেক নারী ও পুরুষ হত্যা করেছে তাঁদের নাম মনে নেই।[৮]

সেদিন কোদালধোয়ায় যারা গণহত্যার স্বীকার হন তাঁদের পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. লক্ষণ দাস, পিতা – অশ্বিনী কুমার দাস, গৌরনদী, বরিশাল
২. সুনীল চন্দ্র ঘটক, পিতা – নরেন্দ্রনাথ ঘটক, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল, পিতা – লক্ষণ চন্দ্র মণ্ডল, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. স্বপন কুমার বৈষ্ণব, (২) পিতা – সনাতন বৈষ্ণব, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. নীমচাঁদ পাণ্ডে, পিতা – প্রসন্ন পাণ্ডে, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. নিবারণ পাণ্ডে, পিতা – প্রশান্ত পাণ্ডে, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. রসিক চন্দ্র দাস, পিতা – রঞ্জন চন্দ্র দাস, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. যতীন্দ্র নাথ দাস, পিতা – যাদব চন্দ্র দাস, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. অমূল্য বালা, পিতা – রসিক বালা, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. পূর্ণ হাজরা (প্যাকা), পিতা – ধনঞ্জয় হাজরা, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১. নরেশ ওঝা, পিতা – চণ্ডী চরণ ওঝা, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. ব্রজেন্দ্র নাথ ওঝা, পিতা – গণেশ চন্দ্র ওঝা, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৩. কানাই ওঝা, পিতা – নিত্যানন্দ ওঝা, জলির পাড়, কোদালধোয়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

রাংতা বেপারী বাড়ি গণহত্যা

সবুজ বৃক্ষরাজি ও ফসলি জমি বেষ্টিত প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র রাংতা গ্রাম। এ গ্রামের মধ্যে মেটো রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে বিলের মধ্যে ছিল বেপারী বাড়ি। বাড়িটি আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ১৪ মে পাকসেনারা গৌরনদীর উপজেলার বাকাই ও দোনারকান্দি গ্রামে জনতার হাতে চার জন মারা যাওয়ার পর তারা উন্মাদ হয়ে বিলাঞ্চলে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ১৫ মে গৌরনদী ক্যাম্প থেকে পাক-আর্মিরা টরকী, কসবা, রামসিদ্ধি, চাঁদশীসহ বিভিন্ন গ্রামে ঘড়-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও গণহত্যা করতে করতে পশ্চিম দিকে বিলাঞ্চলে আসতে থাকে। সাধারণ মানুষ মনে করেছিল রাস্তা বিহীন বিলাঞ্চলে আর্মিরা আসতে পারবে না। তাই বেপারি বাড়ি নিরাপদ আশ্রয় মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক লোক আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে পাক-আর্মিরা হাটু সমান পানি অতিক্রম করে রাজাকারদের দেখানো পথে বেপারী বাড়িতে এসে ফাঁকা গুলি করে। সাথে সাথে শতশত মানুষ বাড়ির উত্তর পাশের ডোবা ও ঝোঁপঝাঁড়ে আশ্রয় নেয়। ছোটাছুটি করতে থাকা আতঙ্কিত মানুষগুলোকে তখন পাখির মতো গুলি করে মারতে থাকে। সাথে সাথে বাড়ি-ঘরেও আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তখন বেপারী বাড়ির চারদিকে

অজস্র লোক নিহত হন। ঘটনার তিন দিন পর লাশগুলোকে গণকবরে সমাহিত করা হয়। এই গণহত্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী সাবিত্রী বেপারী বলেন–

> রাংতার মাটির রাস্তা দিয়ে বাঁশের সাঁকো পাড় হয়ে মিলিটারির বহর উত্তর দিকে আমাদের পাড়ায় আসে। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিক মিলিটারি আসতেছে দেখে আমি তিন বছরের মেয়েকে (মায়া রাণী) নিয়ে দৌড়ে গিয়ে জব্বার মিয়ার বাড়িতে উঠি। আমার স্বামী উত্তর পাশের ডোবার মধ্যে কোনো রকমে কচুরিপানার মধ্যে নাক জাগিয়ে বেঁচে থাকে। মিলিটারির দল রাইফেল উচিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে। ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। আমাদের বাড়িরই ৭ জনকে মেরে ফেলে। টরকী বন্দর থেকে আশ্রয় নেওয়া নির্মল চক্রবর্তীর বাড়ির ১০ জনকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়া আশ-পাশের বাড়িরও অনেককে হত্যা করে। মিলিটারি যাওয়ার পর বাড়ি এসে দেখি ১৯ জনের লাশ পড়ে রয়েছে।[১]

সেদিন যারা গণহত্যার স্বীকার হন তাঁদের পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

১. সুনীতি বেপারী (৩২), স্বামী – বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. বকুল বেপারী (৮), পিতা – বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. বিমল বেপারী (৪), পিতা – বিনোদ বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. নিতাই বেপারী (৩৫) পিতা – মাধব বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. গোলাপী বেপারী (৩০) পিতা – মাধব বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. মানিক্য বেপারী (২৫) পিতা – মাধব বেপারী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. নিরঞ্জন বেপারীর ভাইয়ের স্ত্রী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. নিরঞ্জন বেপারীর ভাইয়ের মেয়ে, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. ভক্ত বেপারীর ভাইয়ের স্ত্রী, রাংতা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. টরকী বন্দরের ব্যবসায়ী নির্মল চক্রবর্তীর (গৌরনদী, বরিশাল) পরিবারের ১০ জন

সিহিপাশা গ্রামে গণহত্যা

আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে ৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে শিহিপাশা গ্রাম অবস্থিত। গৌরনদীতে পাকসেনাদের ক্যাম্প শিহিপাশা থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। তাই অতি সহজেই পাকসেনারা শিহিপাশা হাওলাদার বাড়িতে আক্রমণ করে। স্থানীয় রাজাকার গণি ব্যাপারী ও নুরু খান পাকসেনাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করে। ১৫ মে সকাল ১১ টার দিকে কয়েক প্লাটুন সৈন্য, হালকা মেশিনগান আর আধুনিক অস্ত্রসহ অতর্কিতভাবে এই গ্রামে হামলা চালায়। তারা প্রথমে মোল্লা বাড়িতে, হাওলাদার বাড়িতে, কুমার পাড়ায় গোসাই পালের বাড়িতে, তিলক পালের বাড়িতে ও রসিক পালের ঘর-বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মিলিটারির বহর দেখে আতঙ্কিত হয়ে প্রায় সবাই বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু সমাজসেবক তরণি পালের ঠাকুরমা সাবিত্রী দেবী ভিটামাটি আঁকড়ে পড়ে থাকেন। পাকসেনারা তাঁর ইজ্জত হননের চেষ্টা করলে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা চালালে তাঁকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি ছটফট করতে করতে কয়েক ঘণ্টা পরে গৃহাভ্যন্তরে প্রাণত্যাগ করেন। কুমারপাড়া যখন দাউদাউ করে জ্বলছে তখন আগুনের কালো ধোঁয়া অজগর সাপের ন্যায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। শতশত কৃষক এ সময় আউশ আমনের ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে। এসময় মাঠের কৃষকেরা একত্রিত হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে নিজের বাড়ি-ঘর ও স্বজনদের রক্ষার জন্য সামনের দিকে এগুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পাকসেনারা তাঁদের পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে।

উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অত্র গ্রামের নিবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা সেকান্দার মৃধা এ বিষয়ে বলেন–

> মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাকসেনারা রাজাকারদের সহায়তায় আক্রমণ করে গণহত্যা চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গ্রামটি কিছুটা দুর্গম এলাকা বিধায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য শহর-বন্দর থেকে অনেক মানুষ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তারা পাকসেনাদের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।[৯০]

এখানে সেদিন নারী ও শিশুসহ সর্বমোট ১৫-২০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। যাঁদের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন–

১. কামিজ উদ্দিন হাওলাদার (৫৫), পিতা – এসাম উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. জামিল উদ্দিন হাওলাদার (৩৫), পিতা – এসাম উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. রূপবান বিবি, স্বামী – কামিজ উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. সামসুদ্দিন হাওলাদার, পিতা – কছিম উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. বরু বিবি (৩৫), স্বামী – সামসুদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. জালাল হাওলাদার (৫), পিতা – সামসুদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. আবেদ আলী হাওলাদার (৩৫), পিতা – সোনামুদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. আনোয়ার হাওলাদার (১০), পিতা – আবেদ আলী হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. ঘালিমা (১৫), পিতা – কামিজ উদ্দিন হাওলাদার, শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।*

পতিহার ও বিল্ল গ্রাম গণহত্যা

আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে পতিহার ও বিল্ল গ্রাম নামে পাশাপাশি দুটি গ্রাম অবস্থিত। মূলত গ্রাম দুটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত তাই স্থানীয় রাজাকার শাহে আলীর নির্দেশে পাকহানাদারদের আক্রোসের কারণ হয়। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক আব্দুর রব সেরনিয়বাত বাড়ি সেরাল যাওয়ার কথা ছিল। সেই পথে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা পতিহার ও বিল্ল গ্রামের সামনে যাকে পেয়েছে পাকসেনারা তাকেই হত্যা করেছে। দিনটি ছিল ১৬ মে, সকাল ৯টা-১০টার দিকে পাকসেনারা পতিহার গ্রামে ঢুকে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এখানে পাঁচটি পাড়ায় দত্ত বাড়ি, নাগ বাড়ি, সরকার বাড়ি, বিশ্বাস বাড়ি, কর বাড়ি, সোম বাড়ি, মজুমদার বাড়িসহ বিভিন্ন বাড়িতে ৩০০ থেকে ৪০০ ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। সেই সাথে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। গ্রামের অধিবাসীরা পাক আর্মির উপস্থিতি টের পেয়ে আগেই পালিয়ে মুসলিম বাড়ি, খ্রিস্টান বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে। সেই সুযোগে স্থানীয় রাজাকারেরা ধান-চাল, গৃহপালিত পশু থেকে আরম্ভ করে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। সর্বমোট এই গ্রামে নারী ও শিশুসহ ১৫ জনকে হত্যা করা হয়।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নারায়ণ চন্দ্র নাগ বলেন–

> এপ্রিল মাসের শেষের দিকে পাক-হানাদার বাহিনী গৌরনদীতে ক্যাম্প স্থাপন করার পর থেকেই আতঙ্কে থাকতাম কখন আমাদের এলাকায় আক্রমণ করে বসে। এর মধ্যে খবর

> পেলাম পূর্ব দিকের বিভিন্ন গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। আমি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পাশের গ্রামে (টেমারে) রাজেন্দ্র বাড়ৈয়ের বাড়ির উত্তর পাশে ঝোঁপের মধ্যে আশ্রয় নিই। পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখি ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে পালাচ্ছে। ঘণ্টা দেড়েক পর গোলাগুলির শব্দ না পেয়ে বুঝতে পারলাম আর্মিরা চলে গেছে। তখন প্রথমে আমার নিকট আত্মীয় ভদ্র বাড়িতে দিয়ে দেখি রজনী কান্ত ভদ্রের গুলি বিদ্ধ লাশ। তখন মৃত দেহটি কয়েক জন মিলে মুখে অগ্নিসংয়োগ করে মাটি চাপা দেই। এরপর দত্ত বাড়িতে গিয়ে শুনি রাজাকার এবং আর্মিরা নিত্যানন্দ দত্তকে দিয়ে ডাব পাড়িয়ে খেয়ে দৌড় দিতে বলে অমনি পিছন দিক থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে।[১৯]

পতিহার ও বিল্ল গ্রাম গণহত্যায় যারা প্রাণ হারান তাঁরা হলেন–

১. বাশীরাম হালদার (৫০), পিতা – শ্রীনাথ হালদার, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
২. লক্ষ্মীকান্ত হালদার (৪৫), পিতা – কালীচরণ হালদার, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৩. রজনী ভদ্র (৬০), পিতা – অনন্ত ভদ্র, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৪. নিতাই দত্ত (২৫), পিতা – নকুল দত্ত, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৫. নীলা সোম (২৫), স্বামী –যাদব সোম, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৬. নারায়ণ পাল (৫০), পিতা – গোসাই পাল, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৭. চন্দ্রকান্ত শীল (৫৫), পিতা – সঞ্জিত শীল, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৮. কেষ্ট শীল (৪০), পিতা – কাশিনাথ শীল, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল
৯. অনিল কর (৩৫), পিতা – মহেন্দ্র নাথ কর, বিল্লগ্রাম (এলাকার আত্মীয়)
১০. প্রফুল্ল শীল, পিতা – চিত্তরঞ্জন শীল, পতিহার, আগৈলঝাড়া, বলিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।*

রথখোলা গণহত্যা

আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে পাঁচ কিলোমিটার পূর্ব দিকে রথখোলা অবস্থিত। ৩০ মে সকালের দিকে পাকসেনারা রথখোলায় গণহত্যা চালায়। তাদের অতর্কিত আক্রমণে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিলে দুইজন বৃদ্ধা অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন। সর্বমোট এই গ্রামে নারী ও শিশুসহ অনেক হিন্দু জনগণ হত্যার শিকার হয়। অন্যরা পালিয়ে পাশের মুসলিম বাড়িতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সেদিন যারা গণহত্যার শিকার হন তাদের সবার নাম জানা যায়নি। মাত্র কয়েক জনের নাম স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে জানা যায়। তাঁদের মতে অনেকের নাম তারা ভুলে গেছেন, শিশুদের নাম মনে নেই। রথখোলা গণহত্যা সম্পর্কে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুর হক সরদার বলেন–

> গৌরনদী পাকিস্তান ক্যাম্প থেকে একদল সৈন্য রাজাকারদের ইশারায় মুক্তিযোদ্ধা আবদুল সালামকে খুঁজতে থাকে। কারণ সে কটকস্থল যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বাজারের মধ্যে ঢুকে প্রথমে মাছের ডালি মাথায় তিন জন মাছ বিক্রেতাকে হত্যা করে। মুক্তিযোদ্ধা আবদুল সালাম টের পেয়ে আঁকা-বাঁকা জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায় গিয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী পাল পাড়ায় প্রবেশ করে অগ্নিসংযোগ করে। তাতে দুজন বৃদ্ধা অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হন।[২০]

রথখোলা গণহত্যায় নিহত যাদের নাম জান গেছে, তাঁরা হলেন–

১. বিশ্বনাথ দেব, (৪৫) রথখোলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. নগেন, (৩৫) রথখোলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

৩. পরেশ, (৪০) রথখোলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. কেষ্ট পালের মা, (৫৫) রথখোলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. কৃষ্ণ পালের মা, (৬০) রথখোলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।*

গৈলা দত্তবাড়ি গণহত্যা

আগৈলঝাড়া থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে গৈলা দত্তবাড়ি অবস্থিত। ১ মে দত্তবাড়িতে নির্মম গণহত্যা সংগঠিত হয়। গণহত্যাটি 'দত্তবাড়ি গণহত্যা' নামে পরিচিত হলেও দাসরাড়ি, বক্সী বাড়ির কয়েক জনও হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। দেশীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় গৌরনদী আর্মি ক্যাম্প থেকে সকাল দশটার দিকে আর্মিরা হঠাৎ করে দত্তবাড়িতে হাজির হয়। সেদিন রাজাকারেরা মিথ্যা কথা বলে উপস্থিত সকলকে বোঝায় এলাকায় যাতে করে ডাকাতি-লুটপাট-নারী নির্যাতন না হয় সে জন্য গৌরনদীতে গিয়ে আলোচনা করতে হবে। সে সময় তারা যে সকল পুরুষদের বাড়িতে পেয়েছে তাদেরকে গাড়িতে তুলে গৌরনদীতে বধ্যভূমি নামে খ্যাত হাতেম পিয়নের বাড়ির উত্তর পাশে ঘাটলায় নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। ঐদিন সুরেন্দ্র চক্রবর্তী নামে প্রভাবশালী হিন্দুকে নিয়ে যায়। সে উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারতো বিধায় পূর্বে তাঁকে একবার ধরে নিয়ে একটি পরিচয় পত্র দিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে সেদিন আর তাঁর শেষ রক্ষা হয়নি। এ গণহত্যায় ১৪ জনের তথ্য পাওয়া যায়।

সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সুনীল কুমার দাস বলেন–

> দত্ত বাড়ির পাশে আমার মাসি বাড়ি। সেদিন আমাদের কয়েক জনের ঐবাড়িতে ডাব খেতে যাওয়ার কথা ছিল। কোনো এক কারণে যাওয়া হয়নি। সেদিন আগে ১১ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আরও ৩ জনকে ধরে নেয়। প্রথমে সিনিয়র কয়েক জনকে মিথ্যা বলে গৌরনদীতে নিয়ে, পরে তাঁদেরকে হত্যা করে। মূলত প্রভাবশালী হিন্দুদের টার্গেট করে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে হত্যা করে। আটককৃতদের গৌরনদীর হাতেম পিয়নের ঘাটলায় নিয়ে গুলি করে ও জবাই করে হত্যা করে। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তাদের সবার নাম জানা যায়নি।[১০]

সেদিন যাঁরা নির্মম গণহত্যার শিকার হন, তাঁদের তালিকা (অসমাপ্ত) নিম্নরূপ–

১. বিশ্বনাথ দত্ত, পিতা – সূর্য কান্ত দত্ত, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. সূর্য কান্ত দত্ত, পিতা – কালীকুমার দত্ত, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. শিবশংকর দত্ত, পিতা – নলীনি রঞ্জন দত্ত, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতা – বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. উপেন দাস, পিতা – হরগোবিন্দ দাস, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. কালিচরণ দাস, পিতা – নিশিকান্ত দাস, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. নির্মল দাস, পিতা – কালিচরণ দাস, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. সুভাস দাস, পিতা – প্রভাত দাস, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. ভোলানাথ চন্দ, পিতা – উপেন্দ্রনাথ চন্দ, গৈলার জামাই, জেলা - গোপালগঞ্জ, বরিশাল
১০. জীতেন বক্সী, পিতা – ললিত বক্সী, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১. নান্টু চন্দ, পিতা – অজ্ঞাত, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. নাম না জানা কর্মচারী দুই জন

বাগদা দাসপাড়া গণহত্যা

আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে বাগদা গ্রাম অবস্থিত। বৃহত্তর এই গ্রামের একটি পাড়া 'দাসপাড়া' নামে পরিচিত। ১৬ জুন বিকেলের দিকে পাকসেনারা এখানে আক্রমণ করে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। গ্রামের মানুষ পাকসেনার উপস্থিতি টের পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য পাশের মুসলিম পাড়ায়, কেউ ধান ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে। কিছু লোক বিলে আশ্রয় নিলে তাঁদেরকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। এই দিন কোটালীপাড়া থেকে বেড়াতে আসা তিন জন অতিথিও পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এডভোকেট দেবদাস সমদ্দার এ প্রসঙ্গে বলেন –

> সেদিন পাক আর্মিরা বিকেল চারটার দিকে স্পিডবোটে করে ধীরেধীরে এসে বিভিন্ন দিকে মর্টার শেল মারে এবং গুলি করতে থাকে। আমি দূর থেকে দেখে জঙ্গলের দিকে ঢুকে পড়ি। সেখান থেকে লক্ষ্য করি তারা পূর্ব পাড়ে নেমে প্রথমে দেবেন চ্যাটার্জীর বাড়িতে যায়, তিনি হাত জোর করে পাক-আর্মিদের অনেক অনুনয় বিনয় করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ গুলি করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর আর্মিরা দুইশ গজ দূরে দাস বাড়ির রাস্তার পাশে মানিক দাসকে ধরে গাছের সাথে বেঁধে হত্যা করে। তাঁদের উভয়কেই মুখাগ্নি করে সমাধিস্থ করা হয়। এরপর কৃষ্ণকান্ত ধুপী ও আমার ভাই সম্ভু নাথ সমদ্দার পাটের খেতে লুকিয়ে ছিল। সেখান থেকে কৃষ্ণকান্ত ধুপীকে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করে। পরে আমাদের দিঘীর দক্ষিণ পাড়ে আমাদের পুরোহিত সুরেন্দ্র নাথ মুখার্জীকে গ্রেনেড চার্জ করে পেট ফেরে দেয়। তিনি বাঁচার জন্য একটু জল চেয়েছিল, বিপ্লব সমদ্দার একটু জল দেয়ার পরই মারা গেলেন।[১৪]

এভাবে মোট ১৫ জন নিহত হন। তাঁরা হলেন–

১. সুরেন ধুপী, (১৪) পিতা – নীলকান্ত ধুপী, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. কৃষ্ণকান্ত ধুপী, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. অমূল্য ধুপী, (৫৫) পিতা – কেদারী ধুপী, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. সুধীর ধুপী, (২০) পিতা - কালীচরণ ধুপী, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. হরিপদ ধুপী, (৪০) পিতা – লক্ষ্মীকান্ত ধুপী, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. গণেশ ধুপী, (৬০) পিতা – বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. দেবেন চক্রবর্তী, (৫০) পিতা – অমৃত চক্রবর্তী, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. সুরেন মুখার্জী, (৬০) পিতা – বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. কেষ্ট শীল, (৩০) পিতা – কালীচরণ শীল, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. সতীশ সমদ্দার, (৩৫) পিতা – মনোহর সমদ্দার, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১. কালু সমদ্দার, (৪০) পিতা – দীনবন্ধু সমদ্দার, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. রাইচরণ হুর, (৭০) পিতা – অম্বিক হুর, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৩. ললিত কীর্তনীয়া, (৬০) পিতা – কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৪. অনিল কীর্তনীয়া, (২৫) পিতা – ললিত কীর্তনীয়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
১৫. নরেন দাসের স্ত্রী, দাস পাড়া, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৬. নরেন দাসের শিশু পুত্র, দাস পাড়া, বাগদা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।*

রাজিহার গ্রামে গণহত্যা

রাজিহার একটি বর্ধিষ্ণুগ্রাম। এটি আগৈলঝাড়া উপজেলা কার্যালয় থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তরে ঐতিহাসিক কেতনার বিলের পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে গ্রামটি পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম

পাড়া নামে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত। একাধিকবার পাক হানাদার বাহিনী এ গ্রামে আক্রমণ করে। পাকসেনারা ১৯৭১ সালের ১৫ মে রামসিদ্ধি, চাঁদশী, শিহিপাশা, রাংতা, কেতনার বিল প্রভৃতি স্থানে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ করতে করতে পূর্ব রাজিহারে আক্রমণ করে। সেদিনের ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করেন পূর্ব পাড়ার অধিবাসী প্রত্যক্ষদর্শী, পেশায় ব্যবসায়ী বর্ষীয়ান মানুষ রথীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর বর্ণনা মতে–

> ঐ দিন সকাল বেলা রাজিহার বাজারে আমার দর্জির দোকানে যাই। বেলা ১০ টার পরেমিলিটারি আগমনের খবর পাই। কিছুক্ষণ পরে পূর্বদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। আমি দৌড়ে আধা কিলোমিটার দূরে বাড়িতে আসি। অতি দ্রুত স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে নিয়ে মাঠের মাঝখানে জলমগ্ন পাটক্ষেতে আশ্রয় নেই। ছোট ভাই অমলেন্দ্রনাথসহ আরও অনেকে পাটক্ষেতে লুকিয়ে থাকে। এসময় পাকসেনারা পাশের শিকারী বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। মিলিটারি ও তাদের দোসররা দত্ত বাড়িতে প্রবেশ করে লুটপাট করে জিনিসপত্র নিয়ে যায়। এরপর মিলিটারিদের একটি অংশ খালপাড় সংলগ্ন দত্ত বাড়িতে (বর্তমানে সামাদ মিয়ার বাড়ি) আগুন লাগিয়ে দেয়। পর্যায়ক্রমে তাঁরা লক্ষ্মী বোসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তারপর রাজাকারদের সহায়তায় দক্ষিণ পাশে হালদার বাড়ি ও শীল বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পাকসেনারা এসময় শারীরিক প্রতিবন্ধী জীতেন সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে ঘরে আবদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে নৃসংশভাবে হত্যা করে।[১৮]

মধ্য-রাজিহার খ্রিস্টানপাড়া গণহত্যা

স্থানীয় রাজাকার আফতাব মুন্সি ও জয়নাল মুন্সিসহ বেশ কয়েক জন দেশীয় দোসরদের সহায়তায় ১৭ জুন সোমবার দুপুরে পাকিস্তানি সেনারা রাস্তার পাশে খ্রিস্টানপাড়ায় প্রবেশ করে। এই পাড়ার খ্রিস্টান ধর্মাবম্বীদের ধারণা ছিল পাকসেনারা অত্র এলাকায় প্রবেশ করলেও খ্রিস্টানদের মারবে না। পাকসেনারা মূলত হিন্দু এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁদেরকে টার্গেট করে মারতে-ধরতে আসে। ইতঃপূর্বেও খ্রিস্টানদের হত্যার কোনো খবর তাঁরা পাননি, এ বিশ্বাসে কোনো নারী-পুরুষ পালাবার চেষ্টা করেননি। এমনকি মহিলাদের কাছে বাড়ির পুরুষদের কথা জিজ্ঞাসা করলেও নির্দ্বিধায় বলে দেয়। পুরুষরা পাকসেনাদের সামনে এসে বলে – বাংলার খ্রিস্টানরা পাকিস্তানের শত্রু নয়। এ বিশ্বাসই ১৭ জুন ভুল প্রমাণিত হয়। আটকে যাওয়া স্পিডবোট সরানোর মিথ্যা কথা বলে ৯ জন খ্রিস্টান পুরুষকে ধরে নিয়ে ব্রাশফায়ার ও গুলি চালিয়ে হত্যা করে। পাক-বাহিনী ৯ জনকে ধরে নিয়ে ব্রাস ফায়ার করলেও ভাগ্যক্রমে মুকুল হালদার ও সুকুমার হালদার গুলির সাথে সাথে শুয়ে পড়ে লাশের ভান করে প্রাণে রক্ষা পান।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ বিমল হালদারের স্ত্রী কমলা হালদার বলেন–

> আমাদের বাড়িতে ক্রুশ টানানো থাকলেও দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাক সেনারা দুটি স্পিডবোট পশ্চিম দিক থেকে এসে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে, ডাব খাওয়ার কথা বলে। বাড়ির পুরুষেরা ঘর থেকে বের হয়ে তাদের দুই কুড়ির মতো ডাব খাওয়ায়। তারপর তারা পুরুষদের বলে আমাদের সাথে পাশের গ্রামে যেতে হবে। আসার পথে স্পিডবোট আসতে সমস্যা হয়েছে তাই আমাদের এগিয়ে দিতে হবে। বাড়ির দুজন পুরুষ একাজে সহায়তার কথা বললেও তারা সকলকে নিয়ে বাকাল হাটে যায়। সেখানে তাঁদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। গুলির শব্দ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছি তাঁদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরে আর্মিরা চলে গেলে বাকালের মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা মৃত্যুর খবর নিয়ে আসে। বিকেলের দিকে নৌকায় করে তাঁদের লাশ নিয়ে এসে একত্রে কবর দেওয়া হয়।[১৯]

সেদিনের ঘটনায় নিহতরা হলেন–

১. বিমল হালদার, (৪০) পিতা – ভোলানাথ হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. স্যামুয়েল হালদার, (৪০) পিতা – গৌরীনাথ হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. নরেন হালদার, (৪৫) পিতা – গৌরীনাথ হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. জয়নাল হালদার, (৪২) পিতা – গৌরীনাথ হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. পেকু হালদার, (৩০) পিতা – নরেন হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. টমাস হালদার, (২৫) পিতা – নরেন হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. অগাস্টিন হালদার, (২০) পিতা – নরেন হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. দানিয়েল হালদার, (২২) পিতা – নরেন হালদার, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. যোগেশ হালদার, (৩৫) পিতা – রেবেশ্বর হালদার, নওপাড়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. যোগিন্দ্র নাথ হালদার, (৩০) পিতা – রেবেশ্বর হালদার, নওপাড়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. জগদীশ রায়, (২০) পিতা – দুঃখীরাম রায়, রাজিহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

পশ্চিম সুজনকাঠি গণহত্যা

পশ্চিম সুজনকাঠি গ্রামটি আগৈলঝাড়া উপজেলার পূর্ব পাশে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। পাক-হানাদার বাহিনী গৌরনদী কলেজে ক্যাম্প তৈরি করার বেশ কিছু দিন পরে ২০ জুন আগৈলঝাড়ায় স্পিডবোট পশ্চিম সুজনকাঠি গ্রামে হামলা করে। তার কারণ হিসেবে জানা যায়, ভারতে নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল উক্ত গ্রামের মণ্টু হালদার। সে সেখানে বসে বোমা তৈরি করার কৌশল আয়ত্ব করে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সে বাংলাদেশে এসে বাড়ির উত্তর পাশের বাগানে বসে বোমা তৈরি করে রেখে আসে। তারপরে রাতে বৃষ্টি হয়। সে সকালে বোমাগুলো কেমন আছে তা দেখার জন্য যায়। হাতে ধরতেই প্রচণ্ড শব্দ হয় এবং তাতে সে আহত হয়। এ খবর পুলিশসহ আশ-পাশের মানুষ জানতে পারলে গ্রামটি স্বাধীনতা বিরোধীদের টার্গেটে পরিণত হয়। তারপরে তাকে ধরে নিয়ে বাজারের একটি দোকানে আটকে রাখলে পেছনের দরজা খুলে খাল পাড় হয়ে সে পালিয়ে আবার ভারতে চলে যায়। পরবর্তীতে বোমা তৈরির বিষয়টি পাকিস্তানি আর্মিরা জানতে পেরে পশ্চিম সুজনকাঠি গ্রামে হাজির হয়ে প্রথমে রামকৃষ্ণ বাড়ৈকে ধরে গুলি করে হত্যা করে। তারপর সামনে যাকে পায় তাকেই ধরে। কাঠিরা নিবাসী নেপাল মণ্ডল (পিতা –বিপিন মণ্ডল) তার ভগ্নিপতি সনাতন রায়ের বাড়িতে বেড়াতে আসলে তাকেও আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। এভাবে রায় বাড়ি, হালদার বাড়ি, বাড়ৈ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আট জনকে ধরে নিয়ে যায়। সেদিনের ঘটনার ভয়াবহতা বর্ণনা করেন উক্ত গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কলেজ শিক্ষক বাবু রণজিৎ বাড়ৈ। তাঁর বর্ণনা মতে–

> ঘটনার দিন বিকাল বেলায় প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে রাজাকারদের দেখানো পথে তাঁদেরকে ধরে গৌরনদী ব্রিজের পাশে গয়না ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সবাইকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করলে নেপাল মণ্ডল খালে পড়ে গিয়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। সে কিছু দূর খালের জলে ভাসতে ভাসতে আসলে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বাকির সবাই নিহত হন।[৯]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নিতাই রায়কে যখন পাকিস্তানী আর্মিরা ধরে নিয়ে যায়। তখন তাকে ছাড়িয়ে আনতে তার পিতা সুরেন রায় পাকিস্তানী আর্মিদের অনেক অনুনয়-বিনয় করে পা জড়িয়ে ধরেন, তারপরও তার ছেলেকে না ছাড়ায় কেঁদে কেঁদে পিছন পিছন দৌড়ে যান স্পিড বোটের কাছে। তখন সাথের এক রাজাকার বলে 'বুইরগা যহন আইছে তহন ওডারেও লন' (বৃদ্ধ যখন আসছে তাই একেও নিয়ে চলেন)। এর কিছু দিন পরে শোনা গেল বর্তমান

টি.এন. টি অফিসের কাছে ফলিয়া বাড়ি যেতে যে পুলটি তৎকালীন সময়ে যেটি ছিল একটি বাঁশের সাকো এর নিচে ভেসে-ভেসে এসে সুরেন রায়ের লাশ বেঁধে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আগৈলঝাড়ার অনেক হিন্দু পরিবারগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন।

সেদিনের ঘটনায় যারা নিহতরা হলেন–

১. সুরেন রায়, পিতা – গোপাল রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. নিতাই রায়, পিতা – সুরেন রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. নির্মল বৈরাগী, পিতা – ব্রজেন্দ্র নাথ বৈরাগী, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. নারায়ণ চন্দ্র রায়, পিতা – উমেশ চন্দ্র রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. রাজকুমার বাড়ৈ, পিতা – লক্ষণ বাড়ৈ, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. নারায়ণ হালদার, (পাত্র), পিতা – অনন্ত হালদার, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. বসন্ত রায়, পশ্চিম সুজনকাঠি, আগৈলঝাড়া, বরিশালবাবুরাম, রাহুতপাড়া, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

এছাড়া আগৈলঝাড়ার পাকসেনা ও দেশীয় রাজকারদের প্রতিহত করতে গিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আত্মদানের শিকার নিম্নোক্ত শহিদেরা–

১. সেনা সদস্য আলাউদ্দিন, পিতা – আব্দুল হাসেম সরদার, গৈলা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
২. মোস্তফা হাওলাদার, পিতা – ফেলু চৌকিদার, উত্তর শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৩. নুরুল ইসলাম, পিতা – কাসেম হাওলাদার, দক্ষিণ শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৪. সেনা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, পিতা – বলু সেপাই, সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৫. মান্নান মোল্লা, পিতা – রওসন মোল্লা, মধ্য শিহিপাশা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৬. আব্দুল মান্নান খান, পিতা – আদরী খান, ভালুকশী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৭. গোলাম মাওলা, পিতা – মুন্সি মতিউর রহমান, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৮. সেকেন্দার আলী বেপারী, পিতা – শাহমদ্দিন, ছোট বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
৯. আব্দুল হক হাওলাদার, পিতা – ফয়জোর আলী হাওলাদার, বসুন্ডা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১০. আব্দুল আজিজ সিকদার, পিতা – হাসান উদ্দিন, বাশাইল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১১. সামসুল হক, পিতা – খাদেম আলী, পয়সা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১২. ইপিআর সদস্য মনসুর আহম্মদ আকন, পিতা – ইমাম আকন, ফুলশ্রী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৩. তৈয়ব আলী বক্তিয়ার, পিতা – ইউসুফ আলী বক্তিয়ার, চাত্রীশিরা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৪. কাজি আব্দুল সালাম, পিতা – আব্দুস সাত্তার, বেলুহার, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৫. ফজলুল হক হাওলাদার, পিতা – হোসেন হাওলাদার, রত্নপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
১৬. ইপিআর সদস্য মহশিন আলী, পিতা – আব্দুল আজিজ, বরিয়ালী, আগৈলঝাড়া, বরিশাল

তথ্যসূত্র: মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা।*

গণকবর পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ

১৯৭১ সালে মহান মক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে লাশ ফেলে যায়। পরে স্থানীয় জনগণ লাশগুলো একত্রিত করে গণকবর দেয়। বরিশাল জেলায় মোট একত্রিশটি গণকবর রয়েছে। এর মধ্যে ৭টিই রয়েছে আগৈলঝাড়া উপজেলায়। সরকারিভাবে গণকবরগুলো চিহ্নিত না হলেও সাধারণ লোক মুখে ছয়টি গণকবরের কথা আলোচিত হয়ে আসছে। সেগুলো হলো–

১. কেতনার বিলে কাশীনাথ পাত্র বাড়ি গণকবর
২. কেতনার বিলে মাখন পাত্র বাড়ি গণকবর
৩. রাংতা বেপারী বাড়ি গণকবর
৪. কাঠিরা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ গণকবর
৫. রাজিহার খ্রিস্টান পল্লী গণকবর
৬. বাগদা দাসপাড়া নীলকান্ত ধুপী বাড়ি গণকবর
৭. বাগদা দাসপাড়া নারায়ণ ধুপী বাড়ি গণকবর

১. কেতনার বিলে গণকবর

রাংতা গ্রামের কেতনার বিলের মধ্যে পাত্র বাড়িতে বরিশাল জেলার সবচেয়ে বড় গণকবর রয়েছে। বিলের পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে হাজার হাজার জনতা নিরাপদে থাকার জন্য কেতনার বিলে আশ্রয় নেয়। তখন জ্যৈষ্ঠমাসে আউশ-আমন ধানের ক্ষেতে হাঁটু সমান জল পেড়িয়ে দেশীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি আর্মিরা নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। গণহত্যার ৩য় দিনেও লাশ সৎকার করা হয়নি। ৪র্থ দিনে শহিদদের লাশ গণকবর দেয়কেতনার বিলের বাসিন্দা হরলাল পাত্র, তাঁর তিন পুত্র সুনীল চন্দ্র পাত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাত্র, মদনমোহন পাত্র। এছাড়া অমূল্য পাত্র, রাজেন পাত্র, মনীন্দ্র পাত্র, রাধাকান্ত পাত্র, ধীরেন বিশ্বাস ও নীলকান্ত বৈদ্য প্রমুখ পাত্র বাড়ির উত্তর পাশে সাতটি গর্ত করে। এদের মধ্যে অন্যতম সুনীল চন্দ্র পাত্র বলেন–

> গণহত্যার তিন দিন পর ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বিশ-পঁচিশ জন লোক মিলে পাঁচ জন করে কবর দেওয়ার প্রস্তুতি নেই। একটা লাশের ওজন এত বেশি যে চার জন মিলে ধরে কবরে আনতে হয়। দেখি মহিলাদের লাশে কাপড় পর্যন্ত নাই। মৃত্যুর পরে বিলের মধ্যে রাজাকারদের তাণ্ডব শুরু হয়। তারা মহিলাদের সোনা-গহনা ও কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে যায়। লাশে প্রচণ্ড গন্ধ হওয়ার ধরার উপায় ছিল না। তখন পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে কেরোসিন মেখে নাকে ঢুকিয়ে ৩৫ টি লাশ কবর দেই। আর শত শত লাশ বিলের মধ্যে হাঁটু সমান জলে পড়ে থাকে। যা পরে শিয়াল-কুকুর আর শকুনের খাবারে পরিণত হয়।[৯]

কেতনার বিলের গণহত্যার স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য ২০২২ সালে সরকারের পক্ষ থেকে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এখানে একটি মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সেই সাথে পাকা রাস্তা নির্মাণ করে যোগাযোগের সুব্যবস্থা করা হয়। এতে অত্র এলাকার জনগণের দীর্ঘ দিনের দাবি পুরণ হয়েছে। তবে যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের নাম এখনও গেজেটভুক্ত হয়নি, পরিবারসমূহও পায়নি শহিদ পরিবারের স্বীকৃতি।

২. কেতনার বিলে মাখন পাত্র বাড়ি গণকবর

দক্ষিণ বাংলার সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনা ঘটে কেতনার বিলে। ১৫ মে দুপুরের দিকে এই গণহত্যা সংঘটিত হয়। কেননা কেতনার বিল নিরাপদ আশ্রয় মনে করে পূর্ব উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে হাজার হাজার লোক আশ্রয় নেয়। পাক-আর্মিরা তাদেরকে পাখির মতো গুলি করে

হত্যা করে। যে সমস্ত লাশ মাখন পাত্রের বাড়িসহ আশ-পাশে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকে, সেগুলো ঐ বাড়ির পশ্চিম পাশে গণকবরে সমাহিত করা হয়। এই গণকবর সম্পর্কে অমূল্য পাত্র বলেন – গণহত্যার তিন দিন পর সুনীল পাত্র, প্রাণ পাত্র, কেষ্ট পাত্র, রামসিদ্ধির ভুলু সিকদারের ছেলে দুলা সিকদার ও চাঁদশীর কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ ও তপন গৌর আমরা একত্রে মিলিত হয়ে কবর দিতে চেষ্টা করি। কবর দেওয়ার সময় প্রত্যক্ষ করি বেশিরভাগ লাশে কাপড় পর্যন্ত নাই। শিয়াল, কুকুর, শকুন লাশগুলো খাচ্ছে ও মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।[১৯]

৩. রাংতা বেপারী বাড়ি গণকবর

১৪ মে পাক আর্মিরা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে গৌরনদী উপজেলার বাকাই ও দোনারকান্দি গ্রামে আক্রমণ করতে গিয়ে চার জন জনতার হাতে মারা যায়। ১৫ মে প্রতিশোধের নেশায় পাক-আর্মিরা টরকী, কসবা, রামসিদ্ধি, চাঁদশীসহ বিভিন্ন গ্রামে ঘড়-বাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও গণহত্যা করতে করতে পশ্চিম দিকে আসতে থাকে। প্রাণের ভয়ে মানুষ বিলাঞ্চলের দিকে আশ্রয় খোঁজে। কসবা থেকে রাজিহার পর্যন্ত গ্রামীণ মেটো রাস্তায় পাক-আর্মিরা এগুতে থাকে। রাস্তার আশ-পাশে যত লোক পায় তাঁদেরকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। তখন বেপারী বাড়ির চারদিকে অনেক লোক নিহত হন। তাদের লাশগুলোকে গণকবরে সমাহিত করা হয়। শহিদদের লাশ গণকবর দেয় রাংতা বেপারি বাড়ির বাসিন্দা রূপচাঁদ বেপারী, তাঁর ছেলে অনিল বেপারী, কার্তিক বেপারী, বেপারি বাড়ির উত্তরের বাসিন্দা হানিফ খলিফা, লাশের অভিভাবক টরকীর ব্যবসায়ী নিমাই চক্রবর্তী প্রমুখ। এদের মধ্যে অন্যতম অনিল বেপারী এই গণকবর সম্পর্কে বলেন–

> গণহত্যার তিন দিন পর আমরা সারে চার হাত গভীর, সাত হাত লম্বা ও পাশে ছয় হাতের মতো গর্ত করে উনিশ জনকে একত্রে কবর দেই। কবর দেওয়ার সময় বেশিরভাগ লাশই ছিল অর্ধ গলিত, পেট থেকে নাড়ি-ভুঁড়ি বের হওয়া, গন্ধে বমি আসত। মৃত মহিলাদের সাথে সোনার গহনা ছিল সেগুলো এক শ্রেণির লোকেরা লুট করে নিয়ে যায়। টরকীর নিমাই চক্রবর্তীর পরিবারের চার জন সদস্য শহিদ হন যে ঘটনাটি ছিল বড়ই বেদনাদায়ক।[২০]

৪. কাঠিরা ব্যাপ্টিস্ট চার্চ গণকবর

আগৈলঝাড়া উপজেলার কাঠিরা, জোবারপাড়, আশকর গ্রামে পাকিস্তানি আর্মিরা ১৯৭১ সালের ৩০ মে গণহত্যা চালায়। এ হত্যাযজ্ঞ কাঠিরা গণহত্যা নামে পরিচিত। স্থানীয় রাজাকার প্রফুল্ল অরিন্দার (খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোক) দেখানো পথে পাকিস্তানি আর্মিরা এ এলাকায় প্রবেশ করে। সাধারণ জনগণের তথ্য মতে এখানে প্রায় অর্ধশত লোক হত্যা করা হয়। মাইকেল অধিকারীর নির্দেশে শহিদদের লাশগুলো পল অধিকারী, নিত্য মণ্ডল, অধীর বৈরাগী, তিমু অধিকারী, বরুণ ব্যানার্জী ও জয়ন্ত অধিকারী কাঠিরা ব্যাপ্টিস্টচার্চের পাশে গণকবর দেয়। হিমু অধিকারীর বর্ণনানুসারে–

> ৩০ মে কাঠিরা এবং আশ-পাশের এলাকায় ব্যাপক গণহত্যার পরে স্থানীয় রাজাকারেরা লাশগুলো কবর দিতে নিষেধ করে। তাই ওদিন আর কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ৩১ মে সকাল থেকে বড় গর্ত করা হয় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে লাশগুলো আনা হয়। কেউ আত্মরক্ষার্থে পাট ক্ষেতে, কেউ ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে ছিল, সেখানে গিয়েও পাক-আর্মিরা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে। লাশগুলো সমাহিত করার জন্য দুই-তিন জন ধরাধরি করে এনে দুপুর পর্যন্ত গণকবরে আনা হয়।[২১]

৫. রাজিহার খ্রিস্টান পল্লী গণকবর

আগৈলঝাড়া উপজেলা থেকে উত্তর দিকে রাজিহার গ্রামে খ্রিস্টান পল্লীতে পাকিস্তানি আর্মিরা নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। খ্রিস্টান পল্লী থেকে পাকিস্তানি আর্মিরা নয় জনকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম

বাকাল হাটে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে ব্রিজের উপর নিয়ে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে। ভাগ্যক্রমে মুকুল হালদার এবং সুকুমার হালদার নামে দুই জন বেঁচে যান। এই লাশগুলোকে রাজিহার খ্রিস্টান পাড়ায় গণকবরে সমাহিত করা হয়। এই গণকবর সম্পর্কে শহিদ পরিবারের সদস্য শহিদ স্যামুয়েল হালদারের স্ত্রী মারিয়া হালদার বলেন– ঐদিন ২রা আষাঢ় বিকেলে ফ্রান্সিস হালদার, পিটার হালদার, খোকন গোলদার ও অতুল বালার নেতৃত্বে বেশ কয়েক জন মিলে লাশগুলো নৌকায় করে এনে আমাদের হালদার বাড়িতে বড় কবর তৈরি করে একত্রে সমাহিত করা হয়।[২২]

৬. বাগদা দাসপাড়া নীলকান্ত ধুপী বাড়ি গণকবর

১৯৭১ সালের ১৬ জুন পাকসেনারা এখানে বেলা ৩টার দিকে আক্রমণ করে গণহত্যা চালায়। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকা মানুষকে ধরে এনে গুলি করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ মাঠের মধ্যে ধান ক্ষেতে লুকিয়ে ছিল, তাদেরকে ব্রাশফায়ার করে নির্বিচারে হত্যা করে। এই গ্রামে সেদিন কোটালীপাড়া থেকে বেড়াতে আসা তিন জন অতিথিও পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। পাক-আর্মিরা মোট পনেরো জনকে সেদিন হত্যা করে। হত্যার পর গণকবর দেওয়ার সময় নিকটে বসে প্রত্যক্ষ করেন কালিপদ ধুপী ও বিমল চন্দ্র ধুপী। আপন ভাই নিহত হওয়ায় শোকে কবর দেওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। বিমল চন্দ্র ধুপীর বর্ণনানুসারে–

> গণহত্যার দিন কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি তাই পরের দিন ১৭ জুন সকালের দিকে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঐদিনই আবার মিলিটারি আসার খবর লোকমুখে শুনতে পাই। সে অনুসারে কয়েক জন মিলে দাসপাড়ায় নীলকান্ত ধুপীর বাড়ি কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নীলকান্ত ধুপীর বাড়ির পূর্ব পাশের পুকুর পাড়ের উত্তর-পূর্ব কোনে বেলা ১১ টার দিকে দুই-তিন হাত গভীর গর্ত করে মুখে আগুন দিয়ে নীলকান্ত ধুপী, সুবল ধুপী, বিলাশ ধুপী, কার্তিক ধুপী, জোনা ধুপী ও বলাই ধুপীসহ বেশ কয়েক জন অংশগ্রহণ করেন। ঐ কবরে সুরেন ধুপী (১৪),(পিতা – নীলকান্ত ধুপী) ও অমূল্য ধুপীর, (৫৫) (পিতা – কেদারী ধুপী) লাশ কবর দেওয়া হয়।[২৩]

৭. বাগদা দাসপাড়া নারায়ণ ধুপী বাড়ি গণকবর

১৯৭১ সালের ১৬ জুন পাকসেনারা এখানে বেলা ৩ টার দিকে বাগদা দাসপাড়ায় গণহত্যা চালায়। বাগধা দাস পাড়ায় গণহত্যায় যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের কতিপয় শহিদের লাশ নীলকান্ত ধুপীর বাড়ি গণকবরে সমাহিত করা হয়ে এবং কয়েক জন শহিদকে নারায়ণ ধুপীর বাড়ি গণকবরে সমাহিত করা হয়। এ সম্পর্কে কালিপদ ধুপী বলেন–

> ১৬ জুন গণহত্যার পরের দিন ১৭ জুন নারায়ণ ধুপীর বাড়ির দক্ষিণে (ছাড়া বাড়ি নামে খ্যাত) বেলা ১২ টার দিকে মজিদ হাওলাদার ও শ্যাম মাঝিসহ কয়েক জন মিলে শহিদ হরিপদ ধুপী, (পিতা – লক্ষ্মীকান্ত ধুপী) ও গণেশ ধুপীর লাশ কবর দেওয়া হয়। খুব তারাহুরো করে কবর দেওয়া হয়, কেননা ঐদিনই আবার মিলিটারি আসার কথা ছিল। আর দেবেন চক্রবর্তী ও সুরেণ মুখার্জীর লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।[২৪]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বর্তমান প্রবন্ধে প্রাপ্ত ফলাফলের নিম্নরূপ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়:

(ক) মহান মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক তথ্য উৎঘাটিত হয়েছে।
(খ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আগৈলঝাড়ার গণহত্যা ও গণকবরের সন্ধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সন্নিবেশ করবে।
(গ) বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম অবদান সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।
(ঘ) তরুণ প্রজন্ম দেশপ্রেমে জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে।

উপসংহার

আগৈরঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনার ও হৃদয়স্পর্শী। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য বিশ্লেষণ করে ১৩টির মতো গণহত্যার চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে আরও বেশি ঘটেছে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর এই ব্যথা-বেদনার অন্তর্নিহিত চিত্র তুলে ধরা খুবই কঠিন। কেননা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সকল স্থানে এতো বছরেও স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়নি। এখন পর্যন্ত মাত্র ৪টি স্থানে স্মৃতিচিহ্ন তৈরী করা হয়েছে। সেখানে শহিদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিপিবদ্ধ হয়নি। ঐতিহাসিক কেতনার বিলে যেখানে এক থেকে দেড়হাজার লোক শহিদ হয়েছেন, সেখানে মাত্র ৬২ জন শহিদের নামফলক রয়েছে। কোদালধোয়ার গণহত্যার স্মৃতিস্তম্ভে কোনো তালিকাই দেওয়া হয়নি। এমনকি কাঠিরার স্মৃতিস্তম্ভে শহিদদের শুধু নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের পিতার নামসহ পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টুকুও দেওয়া হয়নি। নতুন প্রজন্মের কাছে মহান স্বাধীনতার এই বার্তা পৌঁছে দিতে হলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে প্রকৃত ইতিহাস উপস্থাপন করতে হবে এবং বিশদভাবে গবেষণা করে এর প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। স্বাধীনতার রণাঙ্গনে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের গৌরবময় জীবনালেখ্য অনেক বেশি হৃদয়ে ধারণ করার বিষয়। দুঃখের বিষয় হলো ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং তাঁর আত্মার আত্মীয় আগৈলঝাড়ার জনপ্রিয় নেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে হত্যার মাধ্যমে সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হতে দেয়া হয়নি। শুধু এটুকু বলা যায় সে, বীর শহিদেরা জীবন দিয়ে লিখে গেছেন বাংলাদেশের নাম, আগৈলঝাড়ার নাম। সেদিনকারের ঘটনা না দেখলেও বর্ণবদ্ধ করতে গিয়ে অশ্রুবাষ্পে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হয়। ১৯৭১ সালে আগৈলঝাড়ায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তর গণহত্যা হয়েছিল আগৈলঝাড়ার কেতনার বিলে। এখানে পাকিস্তানি আর্মিরা ব্যাপকভাবে অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, শিশু হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। আগৈলঝাড়া উপজেলাটি আয়তনে ছোট হলেও এখানে যেভাবে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে তাতে প্রায় তিন হাজার লোক শহিদ হয়েছেন। আর যারা আহত হয়েছেন তাঁরা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বেঁচে আছেন। কেউ-বা বার্ধক্যে এসে অসুস্থ হয়ে মানবেতরভাবে জীবন অতিবাহিত করছেন। অনেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেননি। অনেক শহীদ পরিবার তাঁদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের নামটি গেজেটভুক্ত করাতে পারেননি, পাননি শহিদ পরিবারের স্বীকৃতি, পাননি কোনো ভাতা। স্বজনহারা পরিবারগুলো এখনও নিরবে-নিভৃতে চোখের জল ফেলছেন। ধর্ষিতা মা-বোনেরা সাহস করে তাঁর কষ্টের কথাগুলো বলতেও পারছেন না। অনেকে ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়া ঘড়-বাড়িগুলো এখনও ঠিকমতো তুলতে পারেননি। কেউবা দেশের কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন – এই কি তার স্বাধীন স্বদেশ! সময়ের বিবর্তনে দুঃসময়ের স্মৃতিগুলো ফিকে হয়ে আসলেও ক্ষতগুলো এখনও দগদগে। বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা বান্ধব সরকারের নানামুখী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উপর ভর করে নতুন ভোরের আশায় বুক বাঁধছেন মানবেতরভাবে জীবনযাপন করা এসব দেশপ্রেমী মানুষগুলো। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, স্বাধীনতার এতো বছর পর যে সকল গণকবরের সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধা ও সাধারণ জনতা মিলে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মানুষদের সমাধিস্থ করেছেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল নিহতদের গণকবরে সমাহিত করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য বর্তমান সরকার দুটি গণকবরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছেন। রাজিহারে মিশনারী কর্তৃক একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এখনও বেশ কয়েকটি গণকবরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়নি। স্থানীয় সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগণ শহিদদের অমর স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও স্বীকৃতি বিহীন মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জোর দাবি জানান।

তথ্যনির্দেশ

১. হারুন-অর-রশিদ, (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ*, (১ম খণ্ড) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৯৭

২. সাক্ষাৎকার: তালুকদার মোঃ ইউনুস, পিতা – মোঃ শহর আলী তালুকদার, সাবেক সংসদ সদস্য, বরিশাল – ১, ৫ জুলাই ২০২৪

৩. সাক্ষাৎকার: আব্দুর রইচ সেরনিয়াবাত, পিতা – সেকেন্দার আলী সেরনিয়াবাত, উপজেলা চেয়ারম্যান, আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১৮ এপ্রিল ২০২৪

৪. অজয় দাশগুপ্ত, *একাত্তরের ৭১*, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৭-৭৮

৫. সাক্ষাৎকার: রাজেন্দ্রনাথ পাত্র, পিতা – কাশিনাথ পাত্র, গ্রাম – রাংতা (কেতনার বিল), উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল,৬ এপ্রিল ২০২৪

৬. সাক্ষাৎকার: দীনেশ চন্দ্র হালদার, পিতা – গুরুদাস হালদার, গ্রাম – কাঠিরা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল,৯ ডিসেম্বর ২০২৩

৭. সাক্ষাৎকার: হরেকৃষ্ণ রায় পলাশ, পিতা – পুলিন রায়, গ্রাম – বাকাল, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল,৬ এপ্রিল ২০২৪

৮. সাক্ষাৎকার: সুনীল চন্দ্র সরকার, পিতা – সিদ্ধেশ্বর সরকার, গ্রাম – কোদলধোয়া, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ৯ ডিসেম্বর ২০২৩

৯. সাক্ষাৎকার: সাবিত্রী বেপারী, পিতা – স্বামী – অনিল বেপারী, গ্রাম – রাংতা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল,৬ এপ্রিল ২০২৪

১০. সাক্ষাৎকার: সেকান্দার মৃধা, পিতা – হাছোন মৃধা, গ্রাম – শিহিপাশা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল,১১ নভেম্বর ২০২৩

১১. সাক্ষাৎকার: নারায়ণ নাগ, পিতা – বিপিন বিহারী নাগ, গ্রাম – পতিহার, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২৩

১২. সাক্ষাৎকার: সিরাজুর হক সরদার, পিতা – মোঃ আবদুল কাদের সরদার, গ্রামঃ পূর্ব সুজনকাঠি, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ৯ মার্চ ২০২৪

১৩. সাক্ষাৎকার: সুনীল কুমার দাস, পিতা – নলিনী রঞ্জন দাস, গ্রাম – শিহিপাশা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২৩

১৪. সাক্ষাৎকার: সাক্ষাৎকার: এডভোকেট দেবদাস সমদ্দার, পিতা – শান্তি রঞ্জন সমদ্দার, গ্রাম – বাগধা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১১ নভেম্বর ২০২২

১৫. সাক্ষাৎকার: রথীন্দ্রনাথ দত্ত, পিতা – অবনীমোহন দত্ত, গ্রাম – শিহিপাশা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ৪ নভেম্বর ২০২৩

১৬. সাক্ষাৎকার: কমলা হালদার, স্বামী – শহীদ বিমল হালদার, গ্রাম – রাজিহার, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ৪ নভেম্বর ২০২৩

১৭. সাক্ষাৎকার: রণজিৎ বাড়ৈ (৭১), পিতা – বিশ্বেশ্বর বাড়ৈ, গ্রাম – পশ্চিম সুজনকাঠি, ইউনিয়ন – গৈলা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১৯ এপ্রিল ২০২৪

১৮. সাক্ষাৎকার: সুনীল চন্দ্র পাত্র, পিতা – হরলাল পাত্র, গ্রাম – রাজিহার, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১২ এপ্রিল, ২০২৪

১৯. সাক্ষাৎকার: অমূল্য পাত্র, পিতা – কাশিনাথ পাত্র, গ্রাম – রাংতা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১২ এপ্রিল, ২০২৪

২০. সাক্ষাৎকার: অনিল বেপারী, পিতা – রূপচাঁদ বেপারী, গ্রাম – রাংতা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১২ এপ্রিল, ২০২৪

২১. সাক্ষাৎকার: হিমু অধিকারী, পিতা – সমীর অধিকারী, গ্রাম – কাঠিরা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১৩ এপ্রিল, ২০২৪

২২. সাক্ষাৎকার: মারিয়া হালদার, স্বামী – শহিদ স্যামুয়েল হালদার, গ্রাম – রাজিহার, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ১২ এপ্রিল ২০২৪

২৩. সাক্ষাৎকার: বিমল চন্দ্র ধুপী, পিতা – নীলকান্ত ধুপী, গ্রাম – বাগদা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ৬ মে ২০২৪

২৪. সাক্ষাৎকার: কালিপদ ধুপী, পিতা – নীলকান্ত ধুপী, গ্রাম – বাগদা, উপজেলা – আগৈলঝাড়া, জেলা – বরিশাল, ৬ মে২০২৪

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র: ২য় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১৯৮২

২. হাসান হাফিজুর রহমান(সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র: ৩য় খণ্ড*, তথ্য মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-১৯৮২

৩. সিরাজ উদ্দীন আহম্মেদ, বরিশাল বিভাগের মুক্তিযুদ্ধ, ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩

৪. মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ বরিশাল জেলা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯

৫. লুলু আল মারজান, *কেতনার বিল গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০২৩

৬. হিমু অধিকারী, *কাঠিরা গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৪

৭. বীর মুক্তিযোদ্ধা কে. এম. শামসুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, আগৈলঝাড়া, বরিশাল, ২০১৫

৮. বদরু মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *বধ্যভূমির পথে পথে*, বেগবতী প্রকাশনী, ঝিনাইদহ, ২০২৩

৯. প্রেমানন্দ ঘরামী, *নিউজ টাইম*, নেই স্মৃতিসৌধ: মেলেনি শহীদের স্বীকৃতি, বরিশাল, *২০০৯*

১০. কলম সেনগুপ্ত, আজকের পরিবর্তন, কেতনার বিল বধ্যভুমি: শিশু শহীদ অমৃতর কথা, বরিশাল,২০২৩

১১. কালিদাস ভক্ত, আগৈলঝাড়ার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: কেতনারবিলে গণহত্যা প্রসঙ্গ, *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*, ৩৫তম সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ২০২০

১২. মনিরুজ্জামান শাহীন, বরিশাল ৭১: গণহত্যার ইতিবৃত্ত ও প্রকৃতি, *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ* ৭, ঢাকা, ২০১৮